বারোয়ারি উপন্যাস

১৯২১

মূল্য ২॥৹ আড়াই টাকা।

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড — এলাহাবাদ।

প্রাপ্তিস্থান

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,
২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্ — এলাহাবাদ।

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

বারোজন সাহিত্যিক মিলিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "বারোয়ারি।" আসল গল্পের সহিত এই নামের কোনো সংস্রব নাই। এই ধরণের উপন্যাস-গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। "ভারতী" মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি।

এই উপন্যাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের লিপি-ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে।

লেখকগণের লিখিত অংশের

সূচী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

New Artistic Press, Calcutta.

বারোয়ারি উপন্যাস

১

সেবারকার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নানের ফলটা মৈত্রমশায় হাতে-হাতেই পেয়ে গেলেন। যোগস্নান যে এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ সেটা প্রত্যক্ষ করে হরনাথ মৈত্র দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এলেন।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। সেবার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হরনাথ তাঁর যুবতী বিবাহিতা সুন্দরী কন্যা কমলাকে কলকাতায় রেখে এলেন। হরনাথের স্ত্রীর সঙ্গে এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করে নেবার জন্য তাঁদের গ্রামের অনেকগুলি স্ত্রীলোকও এসেছিলেন। স্নানের পর পরস্পরের আঁচলে গেরো বেঁধে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে তাঁরা থেমে গেলেন। সেটা একটা চৌমাথা। সেখানে অসম্ভব ভিড় জমেছে। একজন ইংরেজ পাদ্রী সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলায় বক্তৃতা দিচ্ছিল—"হে বাংলার মনুষ্যসকল,

তোমরা কি! তোমাদের কি সামান্য বুদ্ধি-শক্তিও নাই? গঙ্গাস্নান করিলেই যদি মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারিত, তবে ত গঙ্গাবাসী কুম্ভীর, হাঙ্গর ও ইলিশ মৎস্যের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। তোমাদের বিবেচনা-শক্তি কি শয়তানে একেবারে হরিয়া লইয়াছে? যে-গঙ্গায় স্নান করিলে ধৌত বসন মলিন হইয়া যায়, সে-গঙ্গায় স্নান করিলে মনের ময়লা কিরূপে ধৌত হইতে পারে?"—ইত্যাদি। সাহেবকে ঘিরে এত লোক দাঁড়িয়েছে যে তার মধ্যে দিয়ে পথ করে বেরিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব। সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কেউ বা সাহেবের মুখে বাংলা বুলির তোড় শুনে অবাক হচ্ছে, কেউ বা তার যুক্তি শুনে হাততালি দিচ্ছে।

মৈত্র মশায় মেয়েদের আগে আগে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলেছিলেন আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাদের সাবধান করে দিচ্ছিলেন। এই জায়গাটাতে এসে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে দিলেন—বেশ সাবধানে হাত-ধরাধরি করে থেকো।

ঠিক সেই সময়ে একটা লোক হঠাৎ এক চড় মেরে পাদ্রীর মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলো ছোঁড়া সেই পাদ্রীর দলের উপর গিয়ে পড়ল। তারপরে দুই দলে হাতাহাতি জুতোজুতি সুরু হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে কে যে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিকানা নেই। হরনাথ তাল সামলাতে সামলাতে প্রায় আধপোয়া রাস্তা দূরে গিয়ে পড়লেন।

কাছেই একটা ঘোড়-সওয়ার পুলিশ রাস্তার উপর ছবির মতন দাঁড়িয়েছিল। মারামারি চলেছে দেখে সে ঘোড়া-সমেত একেবারে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে পড়তেই যে-যার পালাতে আরম্ভ করলে। কাদা ছেটকানোর মতন চতুর্দ্দিকে মানুষ ছিটকে পড়তে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সেখানকার হট্টগোল একেবারে সাফ হয়ে গেল।

মৈত্র মশায় আবার মেয়েদের জড় করে বল্লেন—এই দিক দিয়ে এস—

মৈত্র-গিন্নি চাপা গলায় স্বামীকে ডেকে বল্লেন—ওগো কম্‌লি কোথায়? তাকে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—

—কি আপদ, সে আবার গেল কোথায়? তখন থেকে বল্‌ছি, সব সাবধানে চল—

হরনাথ প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলেন,—কম্‌লি—কমলা।

কোথায় কমলা! সে চেঁচামেচিতে কেউ কি কারো ডাক শুনতে পায়?

মেয়েদের একপাশে দাঁড় করিয়ে হরনাথ তখনি সেই বিশাল জনসমুদ্র হাতড়ে ঠেলে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে লাগলেন। মাথায় পাগড়ী বুকে জরির হরফের তাক্‌মা লাগান ভলান্টিয়ারের দল মেয়েদের গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিল, তিনি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে কমলাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেঁচিয়েও যখন কোন কিনারা হল না, তখন মেয়েদের বাসায় রেখে এসে তিনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন।

প্রায় মাসখানেক ধরে পুলিশ, হরনাথ আর ভলাণ্টিয়ারের দল কলকাতার সহর তোলপাড় করে ফেল্লে কিন্তু কমলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মোট কথা, যুবতী মেয়ে কলকাতার রাস্তায় এমনিভাবে হারিয়ে গেলে বাপে যা করে থাকে, তা সবই হল, হলনা কেবল কমলার সন্ধান। হরনাথের সঙ্গে যাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন।

বর্দ্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে হরনাথের দেশ। নিজগ্রামে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি আছে। লোকটি সাদাসিদে কিন্তু বড় রাগী। মনে যা আসে তখনি সেটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলা তাঁর একটা বড় বদ অভ্যাস ছিল। রেখে-ঢেকে কথা বলতে তিনি পারতেন না। তাঁর কয়েক ঘর ধনী যজমান আছে। যজমানী না করলেও তাঁর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হবার অন্য উপায়ও ছিল। হরনাথের উর্দ্ধতন চার-পাঁচ পুরুষ ঐ কাজ করে বেশ দু-পয়সা করে গিয়েছিলেন। নগদ টাকা ছাড়া তাঁর লাখেরাজ জমিও ছিল বিস্তর; তাই থেকে সংসার বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলে যেত। শাস্ত্রপাঠ ও নানারূপ ক্রিয়াকর্ম্মে হরনাথের বড় বেশী রকমের অনুরাগ ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যজমানী করে বেড়ালে ক্রিয়া-কর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হয় বলে তিনি বেছে বেছে কয়েকটি ঘর নিজের জন্যে রেখে বাকি ঘরগুলি গ্রামের অন্য অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। গ্রামে আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। কিন্তু তাদের কারো অবস্থা হরনাথের

মত স্বচ্ছল নয়। বিপদে আপদে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেত, কাজেই দেশের মধ্যে তাঁর অনুগত লোকের অভাব ছিল না। গ্রামের সনাতন সন্ধ্যা-বৈঠকটি মৈত্র মশায়ের চাতালেই নিয়ম করে প্রত্যহ বসত। কাঁদতে কাঁদতে সাদাসিদে হরনাথ কমলার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছে খুলে বলে ফেল্লেন। কিন্তু দেখলেন যে, কমলার কথাটা সেখানে বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ সকলেই এ ব্যাপার জানে; শুধু জানে যে তাই নয়, তিনি যা জানেন তার চেয়েও তারা ঢের বেশী জানে। বাড়ীর ভিতরে এসে হরনাথ গিন্নীকে ডেকে বল্লেন—এর চেয়ে মেয়েটাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে এলেও নিশ্চিন্ত হতুম।

মৈত্রগৃহিণীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। পাশাপাশি শায়িত দুটি মুমূর্ষু রোগীর মধ্যে একজন মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠলে আর একজন তার দিকে যে-রকম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সেই রকম দৃষ্টিতে তিনি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্বামীর যন্ত্রণায় কোনরকম সহানুভূতির কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। কি করে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, ব্যাপারটা তাঁর ধারণাতেই ঠিক আসছিল না। বছর কয়েক আগে বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কমলা কেঁদে বলেছিল—ওমা, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না—কলকাতার সেই বিরাট ভিড়ের মধ্যে থেকে কান্নার সেই পরিচিত সুরটা যেন তাঁর কাণে ভেসে আসতে লাগল।

বছর দশেক আগে এই গ্রামে এক গৃহস্থ-পরিবারে কি একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল, তাই নিয়ে সারা গ্রামে দু-তিন বছর ধরে খুব ঘোঁট আর দলাদলি চলেছিল। এই সম্পর্কে দু' একটা মামলা পর্য্যন্ত আদালতে গড়িয়েছিল। তারপর এই ক' বছর কোন রকম উত্তেজনার অভাবে গ্রামের ছোট-বড় সব সম্প্রদায়ই কেমন যেন মুষড়ে দিন কাটাচ্ছিল। কমলার অন্তর্দ্ধানের দিন কতক পরেই গ্রামবাসীরা হঠাৎ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাঁদের নির্জ্জীব রসনা অনেককাল পরে একটা নতুন রসের স্বাদ পেয়ে বেশ সজীব হয়ে উঠল।

মৈত্রজার চাতালের বৈঠক আর 'তেমন জমে না। ক্রমে আড্ডাটি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটি অন্য আর-এক জায়গায় স্থানান্তরিত হল। কমলা সম্বন্ধে প্রত্যহ নতুন নতুন কথা আবিষ্কৃত হতে লাগল। অবশেষে একদিন জানতে পারা গেল যে যোগেন মিত্রের ছেলে হরেন বাবাজী কমলাকে সরিয়ে রেখেছে। হরেন কলকাতার কলেজে পড়ে, আগে থাকতেই নাকি তার সঙ্গে কমলার সব ঠিকঠাক করা ছিল। শুধু এতদিন সুযোগের অভাবে তারা পালাতে পারে নি, এইবার সুযোগ পেয়ে তারা সরেছে। অনেকদিন আগে থাকতেই কমলার সঙ্গে হরেনের প্রণয় ছিল। লুকিয়ে তাদের পরামর্শ চলত, এটাও অনেকে লক্ষ্য করেছে। তবে যোগেন মিত্রের ছেলের নামে ফস্ করে কিছু বলে ফেলতে এতদিন কেউ সাহস করে নি; আর ব্যাপারটা যে এতদূর পর্য্যন্ত গড়াবে তা কেউ ভাবেও নি। তবে কি না, যখন এতটা হল,

তখন আর না বলে চুপ করে থাকাটা ভাল দেখায় না, তাই শশী মুখুয্যে একদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রায় জন-পনেরো-ষোলো লোকের কাছে খুব গোপনে এই বার্ত্তাটি প্রকাশ করে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে শশী সবাইকে বলে দিলে—দেখো, যেন কথাটি প্রকাশ না হয়। তা হলে যোগেন মিত্তির আর আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। জান ত আমি তার কাছে চাকরি করি—

শশী মুখুয্যে গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্রের খাতাঞ্জিখানায় কাজ করত। কিছুদিন আগে গ্রামের এক আধা-বয়সী কৈবর্ত্ত বিধবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই নিয়ে মৈত্র মশায় শশীর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ হয়ে কৈবর্ত্ত-রমণীর প্রতি অনুরাগী হওয়ার জন্য তিনি তাকে সামাজিক দণ্ড দিতেও চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্য হরনাথের উপর শশীর মনের ভাব বিলক্ষণই তিক্ত ছিল। সে অনেকদিন থেকেই তার উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এতদিন পরে সে সুযোগ মিলল।

হরনাথের সেই ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে সেদিনকার সন্ধ্যা বৈঠকে শশী যে কথাটি বলেছিল, সেটি তার নিছক কল্পনা নয়।

হরেন ও কমলা প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে ভাব ছিল। এক গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে, শিশু কাল থেকে এক জায়গায় তারা বেড়ে উঠেছে, একসঙ্গেই খেলা করেছে, এক পুকুরে এক সঙ্গে সাঁতার কেটেছে। গ্রামের

অন্য মেয়েদের সঙ্গে যে হরেনের ভাবছিল না তা নয়, তবে কমলাদের বাড়ী তাদের পাশেই—সেইজন্যে তাদের মধ্যে মেশামেশিটা বেশী ছিল। কাজেই অন্য মেয়েদের চেয়ে কমলার সঙ্গে হরেনের ভাব একটু বেশী হবার সুযোগও ঘটেছিল।

এই ঘটনার বছর কয়েক আগে একদিন কি কারণে হরেন স্কুলে যায় নি। দুপুর বেলাটা বাড়ীতে বসে না থেকে সে মৈত্রদের খিড়কীর বাগানে ঢুকে একটা পেয়ারা গাছে চড়ে মনের সুখে ডাঁসা পেয়ারা চিবোচ্ছিল, এমন সময়ে সে দেখতে পেলে, যে কমলা বাগানের একধারে দাঁড়িয়ে কি একটা চিঠি পড়ছে। কমলা তখন সদ্য শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে, কার চিঠি সে এত মন দিয়ে পড়ছে, সেটা বিচক্ষণ হরেনের মস্তিষ্কে আসতে বেশী দেরী হল না। পেয়ারা চিবোতে চিবোতে তার মাথায় দুষ্টু-সরস্বতী চাপল। সে গাছ থেকে নেমে পা টিপে টিপে কমলার পিছনে গিয়ে খপ্ করে তার হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে একেবারে দৌড় দিলে। কমলা এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ফিরে দেখলে, হরেন তার চিঠিটা কেড়ে নিয়েছে। লজ্জায় তার মুখ দিয়ে প্রথমটা কোন কথা বেরুল না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কমলা বল্লে—হরেন দা, চিঠি দিয়ে দাও—ভাল হবে না বলছি—

হরেন নির্ব্বিকার চিত্তে বাঁ হাতের পেয়ারাটাতে একটা কামড় মেরে কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলে—

—প্রাণের কমল—

কমলা আর সহ্য করতে না পেরে চিঠিখানা কেড়ে নেবার জন্যে হরেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরেনও নাছোড়বান্দা—দুজনে যখন চিঠি-কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, এমন সময় তারা দেখতে পেলে, কমলাদের খিড়কীর ধারের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে শশী মুখুয্যে একদৃষ্টে তাদের পানেই তাকিয়ে রয়েছে। শশীকে দেখেই হরেন চিঠিখানা ফেলে দিয়ে সে তল্লাট থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কমলা চিঠিখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর চলে এল।

সেদিন সমস্ত-ক্ষণ হরেনের মনটা ভয়ে ভয়ে কাটল। তার মনে হচ্ছিল, খেয়ালের মাথায় কাজটা করে ফেলা ভাল হয় নি। হরেনের বাবা ভয়ানক কড়া লোক ছিলেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারেন যে, সে মৈত্রদের কমলার সঙ্গে চিঠি-কাড়াকাড়ি করছিল, তাহলে আর তিনি তাকে আস্ত রাখবেন না। কমলার সঙ্গে আপোষ করে ফেলবার জন্যে সে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বল্লে—কম্‌লি, কাউকে বলিস্ নে যেন ভাই—

কমলার রাগ তখনো পড়েনি, সে বল্লে—না,—বলবে না বৈ কি! দাঁড়াও, কালই আমি গিয়ে জেঠীমাকে বলে দিয়ে আসব।

হরেন অনুনয় করে বল্লে—তোর পায়ে পড়ি ভাই, লক্ষীটি, আর কক্ষনো তোর চিঠি পড়ব না।

অনেক কষ্টে কমলাকে ঠাণ্ডা করে সে বাড়ী ফিরল; কিন্তু শশীকে ঠাণ্ডা না করা অবধি সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

শশীর চেহারাটা অত্যন্ত কদাকার, তার উপরে তার একটা চোখে ছানি ছিল। গ্রামের ভাল ছেলেরা আড়ালে আর দুষ্টু ছেলেরা সামনেই তাকে কাণা-শশী বলে ডাকত। হরেনও শশীকে দু' একবার কাণা-শশী বলে ডেকেছে। সে জানত যে, এবার শশী আর তাকে ছাড়বে না। ক'দিন দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কাটাবার পর হরেন যখন দেখলে যে শশী সে-কথাটা নিয়ে কোনরকম উচ্চ-বাচ্য করলে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হল।

শশী কিন্তু যে ব্যাপারটা সেদিন নিজের চোখে দেখেছিল, সেটা ভুলতে পারলে না। হরনাথের উপর তার যে-রকম আক্রোশ ছিল, তাতে সেই দিনই সে একটা কুৎসা রটিয়ে দিত, কিন্তু এর মধ্যে তার মনিব-পুত্র থাকাতেই সব মাটী হয়ে গেল। সেই থেকে সে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কমলা হারিয়ে যাওয়ায় সে সেই পুরোণ ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে একটা গল্প বানিয়ে তা' প্রচার করে দিলে।

২

যোগেন মিত্র এই গ্রামের জমিদার। একালের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি একালের শিক্ষার উপর বিষম চটা ছিলেন। যোগেন নিজের হাতে সমস্ত জমিদারী দেখতেন। তিনি নিজে যা বুঝতেন তার উপর অন্য কারো কথা বলবার যো ছিল না। এই

স্বভাবের জন্তে যোগেন জীবনে অনেকবার ঠকেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর স্বভাবের কোন রকম পরিবর্ত্তন হয় নি। গ্রামে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। এক কথায় তাঁর ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। ছেলে বেলায় পিতা-বর্ত্তমানে যোগেন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেন। হঠাৎ কি কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দেশে ফিরে এসে বাপকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর পড়বেন না, নিজেদের জমিদারীর কাজ দেখবেন। যোগেনের বাবা ছিলেন, সেকেলে মানুষ। ছেলের এই মতিগতি দেখে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে যোগেন নিজের জমিদারী চালিয়ে আসছেন। পিতার অবর্ত্তমানে সেই সম্পত্তি বেড়েই চলেছে, ক্ষতি কিছুমাত্র হয় নি। কলকাতা নামক স্থানটির উপর যোগেন হাড়ে-চটা ছিলেন। সেখানকার নাম শুনলেই তিনি এমন সব আপত্তিকর কথা বলতেন যে, সে-সব কথা শুনলে অতি নিরীহ কলকাতাবাসীর পক্ষেও ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত। নিজ-গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না, আর নিজের বাড়ীতে আড়ালেও তাঁর নিন্দে করতে কারো সাহস হত না। হরেন স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবার পর যোগেন তাকে দপ্তরের খাতা চাপা দেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কি কারণে ঠিক জানা যায় না তিনি তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে সম্মত হয়ে তাকে কলেজে পড়তে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

হরেনের ইচ্ছে ছিল, সে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে।

কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার পর তার বাবা বল্লেন, এবার জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখতে আরম্ভ কর। পিতার মুখের উপরে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবার মতন সাহস হরেনের কেন, সে বাড়ীর কারো ছিল না। তবুও একবার সে মাকে দিয়ে তার মনের ইচ্ছাটা কর্ত্তাকে জানিয়ে দিলে।

যোগেনের মেজাজটা সেদিন কেন যে অত ভাল ছিল, তা তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারলেন না। তিনি এক রকম হাল ছেড়ে দিয়েই কথাটা স্বামীর কাছে পেড়েছিলেন। কিন্তু আরজী পেশ হতে-না-হতেই সেটা পাশ হয়ে গেল দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। গিন্নীর মার-প্রাণে কে যেন ভিতর থেকে বলতে লাগল যে তাঁর হরেন ভবিষ্যতে নিশ্চয় একটা বড়লোক হবে তাই ঠাকুর দয়া করে কর্ত্তার এমন সুমতি দিয়েছেন।

কমলার অন্তর্দ্ধান হওয়ার কথাটা গ্রামের ভদ্রলোক এমন কি চাষা-ভুষোদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেলেও গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্তিরের কাছে সেটা আশ্চর্য্য রকমে গোপন রইল। যোগেন বাবু অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে তিলটি পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব গোপন করে পালাতে পারত না। কিন্তু এই সংবাদটা কেমন করে তাঁর কর্ণকুহর ডিঙ্গিয়ে একেবারে অন্দর-মহলে গিয়ে প্রবেশ করলে। জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হলেও যোগেনের স্ত্রী উমাসুন্দরীর নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। যোগেনের কড়া মেজাজ আর শাসনের আবহাওয়ায় থেকে সে-বাড়ীতে কারো ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠবার অবকাশ পেত না।

তিনি ঘর আর বাইরের এমন মালিক ছিলেন যে সেখানে উমাসুন্দরীর মতন ভাল মানুষের নিজে বুঝে কোন কাজ করবার উপায়ও ছিল না। তাঁর কাছে যখন খবর এল যে, তাঁর ছেলে ওবাড়ীর কমলাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন তিনি মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। কথাটা স্বামীকে জানাবার যো নেই, তাহলে হয়ত নিজের সর্ব্বনাশই টেনে আনা হবে, কারণ যোগেন ত প্রথমে হরেনকে কলকাতায় পাঠাতে চায়নি, শুধু তাঁরই অনুরোধে তিনি রাজী হয়েছিলেন। তারপর এই সংবাদ পেলে তিনি হরেনের উপর কি-রকম শাস্তির বন্দোবস্ত করবেন, সেটা উমাসুন্দরী কল্পনাতেও আনতে পারলেন না। হয়ত তিনি রাগের মাথায় হরেনকে বিষয়-চ্যুত করবেন। নিজের ব্যক্তিগত কোন মত না থাকলেও মা হয়ে সেটা কেউ সহ্য করতে পারে না। একবার তাঁর মনে হল, লুকিয়ে হরেনকে একখানা চিঠি লিখে সংবাদটা কতদূর সত্য তার সন্ধান করলে বোধ হয় ভাল হয়। হরেন যে এতবড় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে সেটা তাঁর মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না। যে-ব্যক্তি এই সংবাদটি উমাসুন্দরীর কাছে প্রকাশ করেছিল, সে বলেছিল, ইতিপূর্ব্বেই হরেনের সঙ্গে কমলার প্রণয় ছিল। কিন্তু মা হয়েও ঘুণাক্ষরে সে প্রণয়ের কথা জানতে পারেন নি ভেবে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আবার ভাবলেন হয়ত বা হতেও পারে,—কোন্ মা আর নিজের ছেলেকে এ-বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে? হরেনকে চিঠি লেখবার কথা মনে হতেই আর-এক সমস্যা এল, চিঠি

কে লিখে দেবে? আর চিঠি লিখলেও কর্তার হুকুম আর পাঠ না হলে কোন চিঠির ত দেউড়ী পার হবার উপায় ছিল না।

এই সত্য-মিথ্যা আশা-নিরাশার দারুণ তোলাপাড়া বুকে নিয়ে উমাসুন্দরী দিন কাটাতে লাগলেন। জমিদার বাড়ীতে জমিদার সম্পর্কীয়া অনেক মেয়ে বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নিজের ছেলের সম্বন্ধে এই বিষয় নিয়ে কোন মন্ত্রণা কি আলোচনা তিনি করতে পারতেন না। এই চিন্তা আর তার জন্যে মার প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা,—সেটা তাঁকে একাই ভোগ করতে হত। ওদিককার মৈত্র গৃহিণীর চেয়ে উমাসুন্দরীর মানসিক কষ্টটা কম ছিল না। উমাসুন্দরীর ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার কমলার মার কাছে গিয়ে রহস্যটা বেশ ভাল করে বুঝে আসেন। তাঁরা দুজনেই সেই ছেলেবেলায় বৌ-অবস্থায় এই গ্রামে এসেছিলেন। নববধূর সেই অসহায় অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে তাঁদের প্রণয় বেড়েই চলেছিল, হঠাৎ এই কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে কমলার মার কাছে তাঁর মুখ দেখাতে লজ্জা করতে লাগল। মৈত্র-গৃহিণী আগে প্রায় রোজই দুপুর বেলায় একবার করে পাড়া বেড়াতে বেরুতেন, কিন্তু তীর্থ থেকে অত বড় লজ্জার ডালি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পর তাঁকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যেত না।

কমলার কথা নিয়ে গ্রামের মধ্যে যে ঘোঁট আর আন্দোলন চলেছিল, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সেটা নিভে আসতে

লাগল। গ্রামের বৃদ্ধেরা প্রথমে কথাটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ বাধিয়েছিলেন; কিন্তু যোগেন মিত্রের ছেলের নাম শুনে হঠাৎ তাঁরা যে-যার বেমালুম চেপে গেলেন। যুবাদের দল থেকে নামতে নামতে কাহিনীটা শেষে দেশের ছেলেদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কমলার একটি ছোট ভাই ছিল, তার নাম অরুণ। অরুণ হরেনের ভাই নরেনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। দিদি কলকাতায় হারিয়ে যাওয়ার পরে তাদের বাড়ীতে ও বাইরে যে ব্যাপার চলেছিল, অরুণের সেটা বোঝবার বয়স হয়েছিল। এর মধ্যে কতখানি লজ্জা আর কতটা সামাজিক লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হচ্ছে, আর তার মধ্যে কতটুকু বা তার প্রাপ্য সেটা সে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করত। স্কুলের মাষ্টাররা পড়াতে পড়াতে এক একবার আড়-চোখে, কখনো বা স্থির দৃষ্টিতে যখন তার মুখের দিকে তাকাত কিংবা সমপাঠীরা যখন তার দিকে চেয়ে বা তাকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি করত, কানে তা শুনতে না পেলেও অরুণের বুকের মধ্যে তখন এমন একটা জায়গায় গিয়ে সে কথাগুলো বাজতে থাকত যে তার বেদনায় সে বেচারী অস্থির হয়ে উঠত। বুকের মধ্যে লজ্জা আর অপমানের এই দারুণ বোঝাটা তাকে একলাই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত, কারণ তার যে বয়স এবং যে অবস্থা, তাতে প্রাণের বন্ধু পাওয়া শক্ত। অরুণ তার বাপ-মাকে তার দিদির কোন কথা জিজ্ঞাসা করত

না। তাঁরা যে কষ্ট ভোগ কচ্ছেন, তা দুবেলা সে নিজের চোখেই দেখতে পেত, এটুকু সে বুঝত যে সে কিছু জানতে চাইলে তাঁরা বেশী কষ্ট পাবেন—এই ভেবেই সে চুপ করে থাকত।

অরুণের দিদি আর নরেনের দাদাকে নিয়ে লোকের মুখে-মুখে যে কুৎসাটা রটেছিল, তাতে অরুণ আর নরেন দুজনেরই মনের অবস্থা সমান হওয়া উচিত ছিল। কথাটা যখন প্রথম প্রচার হয়েছিল, তখন অরুণের দেখা-দেখি নরেনও লজ্জায় মুষড়ে পড়েছিল; কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই ক্লাসের ছেলেরা তাকে বুঝিয়ে দিলে, এর মধ্যে তার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই; কারণ মেয়ে যে-তরফের লজ্জাটাও যে সেই তরফের। ক্রমে এমন দিন এল, যখন ক্লাসের ছেলেরা নরেনের দাদার বাহাদুরী দিতে আরম্ভ করলে। স্কুল বসবার আগে ছেলেদের মধ্যে যখন এই নিয়ে গল্প চলত আর তারা যখন হরেনকে বাহাদুর ছেলে বলে তারিফ করত, তখন এমন দাদার ভাই মনে করে নরেনও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল। হয়ত ক্লাসের ছেলেরা কমলা-সম্বন্ধে আলোচনা করছে, তার মধ্যে কেউ একটা বিশ্রী রহস্য করে উঠল, তাতে সমস্ত ছেলে অমনি একেবারে ছাত ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছে, এমন সময় ধীর ভাবে ম্লান মুখে এসে অরুণ ক্লাসে ঢুকল। হঠাৎ সে হাসি থেমে গেল, কেউ হয়ত তখনো হাসি থামাতে পারে নি, মুখে কাপড় দিয়ে আড় চোখে অরুণের দিকে

তাকিয়ে তখনো হাসছে,—কিসের কথা চলছিল, কিসের জন্যে এত হাসি, সেটা জানতে না পেলেও ব্যাপার বুঝতে তার দেরী হত না। কখন কখন এমনও হত যে ছেলেরা অন্য কথা নিয়ে হাসি তামাসা করছে—কিন্তু সে মনে করত যে তার দিদির কথা নিয়েই আলোচনা চলেছে। এ রকম দুঃসহ জীবন যাপন করা ক্রমে সে বেচারীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। অরুণ মনে মনে ভাবলে যে, সে আর স্কুলে যাবে না। কাউকে না জানিয়ে একলা কলকাতায় গিয়ে সে দিদির সন্ধান করবে।

একদিন সকাল বেলা স্কুলে যাবার সময় সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে, আজ থেকে সে আর স্কুলে যাবে না। পড়াশুনার উপর তার খুব মনোযোগ ছিল, অন্য ছেলেদের মত সে কখনো স্কুলে যেতে আপত্তি করে নি। স্কুলে যাবে না শুনে মা জিজ্ঞাসা কল্লেন—স্কুলে যাবি না কেন রে? কি হয়েছে?

এ-কেনর কোন জবাব ছিল না। কি যে হয়েছে তা সকলেই জানে অথচ মুখ ফুটে কারো বলবার কিছু নেই। অরুণ এই কেনর জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন —স্কুলে যাবিনে কেন বাবা? কি হয়েছে?

অরুণ একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে—তোমার পায়ে পড়ি মা, আর আমায় তুমি স্কুলে যেতে বোলো না।

এতদিন ধরে স্কুলে তার উপর যে পীড়ন চলছিল, আবেগের মুখে তা সে সব খুলে বল্‌লে! ছেলের কথা শুনে মাও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মৈত্র মশায় বাইরের চাতালে বসে কি করছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে তিনি ভিতরে এসে স্ত্রীর কাছ থেকে ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যোগেন মিত্তির তখন সবে মাত্র দপ্তরে এসে বসেছেন। ফরাসের উপর একটা উঁচু জায়গায় তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনি ফরসীতে তামাক টানছিলেন, আর চারদিকে আট দশ জন কর্ম্মচারী এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে আছে, তাদের আশে-পাশে ছোট লম্বা বেঁটে নানান্ আকারের খাতা ছড়ানো রয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলো খোলা কতকগুলো বন্ধ। কাজ চলেছে, দপ্তর জম্‌জম্ করছে—এমন সময় ঝড়ের মত ছুটে হরনাথ সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই ভয় পেয়ে গেল। ডান হাতে পৈতেগাছা জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে হরনাথ যোগেনকে বল্লেন—মশায়, এর একটা প্রতিকার করুন। আপনি গ্রামের জমিদার, আমাদের রক্ষক, কি দোষে আমার উপর এতটা অবিচার চলেছে, সেটা আমি জানতে চাই।

হরনাথের কথাবার্ত্তা আর ঐ-রকম মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই তাঁর আসার কারণ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যোগেন মনে করলেন, হয়ত জমিজমা নিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কারো

গোলমাল বেধেছে। তিনি তাঁকে বসতে জায়গা দিয়ে বললেন—বসুন বসুন, অত উত্তেজিত হয়েছেন কেন? ব্যাপার কি খুলে বলুন দেখি।

হরনাথের চোখ দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছিল, তিনি চীৎকার করে বল্লেন—ব্যাপার খুলে বল্‌তে হবে? কি হয়েছে, তা গ্রামের কে না জানে।

যোগেন কোন বিষয়ে বেশী ভণিতা করা আদৌ পছন্দ করতেন না। বিরক্ত হয়ে কর্ম্মচারীদের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মৈত্রমশায়ের কি হয়েছে তোমরা কেউ জানো?

কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই তখন খাতায় মুখ জুবড়ে একমনে কাজে লেগে গেছে। দু'-একজন তাঁর গলা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে মুখের উপর এমন একটা ভাব আনলে, যেন মনে হল, তারা এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

শশী বরাবরই কর্ত্তার চোখের আড়ালে এক কোণে বসে কাজ করত। হরনাথের আগমনে তার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। তার মনে হল, এবার বুঝি সাত পুরুষের বাস্তুভিটের মায়া ত্যাগ করতে হল। মনে মনে দেবতার নাম স্মরণ করে সে খাতায় নাক ঘসতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে যোগেন বল্লেন—কৈ মশায়, কেউ ত কিছু জানে না। আপনিই খুলে বলুন।

হরনাথ বল্লেন—কমলাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানেন ত?

যোগেন এ-বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। তিনি

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এঁ্যা কম্‌লি! কেন, সে কোথায় গেছে!

—কোথায় গেছে! আপনার গুণধর পুত্র তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই বলে হরনাথ কমলার অন্তর্দ্ধানের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে গেল।

যোগেন জীবনে কখনো এত আশ্চর্য্য হন্‌নি। সব চেয়ে তাঁর আশ্চর্য্য লাগল এই যে, কথাটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে, তিনিই জানেন না, অথচ তাঁর বাড়ীর সঙ্গেই এই বিশ্রী ব্যাপারটার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যোগেনের মনে হতে লাগল, হয়ত আরও কত কথা, কত ব্যাপার তাঁর বাড়ীতে ও গ্রামে তাঁর চোখ-কানের অন্তরালে হয়ে যাচ্ছে। নলটা মুখ থেকে জোর করে ছুঁড়ে ফেলে তিনি ডাক দিলেন—শশী—

শশী ততক্ষণ নিজের হাতে নাক-কাণ মলে রণচণ্ডীর দোহাই পাড়ছিল; কর্ত্তার আওয়াজ শুনে কুঁজো হয়ে হাত দুটো জোড় করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাপতে সে কর্ত্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

যোগেন বল্লেন—এ সম্বন্ধে যা জান, সমস্ত কথা খুলে বল। একটি কথা গোপন কর্‌লে তোমাকে এ গ্রাম-ছাড়া করব। আমার নাম যোগেন মিত্তির—

দপ্তরের সবাই মনে করলে, আজ বুঝি তাদের সামনে একটা ব্রহ্মহত্যা হয়! সকলে নির্ব্বাক্ হয়ে শশীর সেই গরুড়ের মতন মূর্ত্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

New Artistic Press, Calcutt

সন্ধ্যা বৈঠকে সকলকার সামনে শশী গোপনে যে বার্ত্তাটি প্রকাশ করেছিল, এতদিনে তার সব কথাগুলো ভাল করে মনেও ছিল না! কাজে কাজেই কাঁপুনির সঙ্গে আমতা-আমতা করতে করতে কমলা ও হরেন সম্বন্ধে সে দস্তুর-মতন একটি নূতন ইতিহাস সদ্য সদ্য বানিয়ে বলে দিলে। শশী বল্লে—হরনাথ দেশে ফিরে আসার পর তার মামাতো ভাইয়ের শালা পশ্চিম যাচ্ছিল, সেই ট্রেণে সে হরেন আর কমলাকে যেতে দেখে তাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

যোগেন তক্তাপোষের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে বল্লেন—উল্লুক, এ-কথা আমায় এতদিন বলনি কেন?

শশী টাল খেতে খেতে চার পাচ পা পিছনে সরে গিয়ে বল্লে—আজ্ঞে, ভয়ে কর্ত্তা।

যোগেন আর কাউকে কিছু না বলে দপ্তর ছেড়ে উঠে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

৩

উমাসুন্দরী তখন সবেমাত্র স্নান সেরে পূজায় বসেছেন; একধারে বামা ঝী বাজারের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ পেড়ে বসেছিল, কটা পয়সার হিসেব তার আর কিছুতেই মিল্‌ছিল না। উমাসুন্দরী সেদিকে ততটা কান দেন্‌নি, তিনি তখন আসনে বসে জপ করছিলেন। খুব নিবিষ্ট চিত্তে হিসেব করতে করতে বামা হঠাৎ চম্‌কে মাথায় আঁচল টেনে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে,—ওমা, কর্ত্তাবাবু

যে গো! বলেই বামা বাজারের ফেরত বাকী পয়সা কটা আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে সেদিক থেকে সরে পড়ল। যোগেন মিত্তির ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এমন সময়ে কর্ত্তা এখানে! উমাসুন্দরী আশ্চর্য্য হলেন; ব্যাপার কি? শশব্যস্তে তিনি স্বামীর মুখের পানে চাইলেন। যোগেন মিত্তিরের সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছিল। সে-মূর্ত্তি দেখে উমাসুন্দরী জপ ভুলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে গা?

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন,—শুনেছ, তোমার হতভাগা ছেলের কীর্ত্তির কথা?

উমাসুন্দরী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, দুই চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন—কার কীর্ত্তি? কে ছেলে?

—তোমার হরেন। যাকে কলকাতায় পাঠিয়েছ,—ভারী বিদ্যে শেখাবে বলে!

উমাসুন্দরী এ-ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন; কিন্তু এ-কথা কর্ত্তার কানে তুললে কে?

তাঁর আশঙ্কা হল, কথাটা কর্ত্তার কাণে যখন উঠেছে, তখন খুবই একটা অঘটন ঘটে যাবে! কথাটা তিনি নিজে মোটেই বিশ্বাস করেন্ নি। ছেলের সম্বন্ধে কোন্ মা-ই বা এমন কথা বিশ্বাস করেন? শুধু এই কারণেই যে তিনি বিশ্বাস করেন নি, তা নয় —তাঁর ছেলেকে তিনি ত চেনেন্! সেই অত আব্দার, বড় হলেও ছেলেমানুষের মত এখনো তার কেমন খামখেয়ালী এলোমেলো

ভাব,—এগুলো যে অত-বড় বিশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না!—লোকে বলে, কমলার সঙ্গে আগে থেকেই না কি তার প্রণয় ছিল! পাগলের কথা! থাকুক প্রণয়! প্রণয়ের অর্থ কি ঐ অত-বড় একটা সর্ব্বনাশের ব্যাপার! তাঁর মন জোর করে কেবলি বল্‌ছিল—না, না, এ মিছে কথা! একেবারে মিছে!

যেন-কিছু-জানেন-না এমনি ভাব দেখিয়ে উমাসুন্দরী বল্‌লেন,—কার কথা বলছ তুমি? হরেন? কি কীর্ত্তি করেছে সে?

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন,—আমাদের মৈত্র মশায়ের মেয়ে কম্‌লিকে নিয়ে ওরা সব কলকাতায় গঙ্গাস্নান কর্‌তে গেছল না কি, তা সেখান থেকে সবাই ফিরেছে, কম্‌লি শুধু দেশে ফেরেনি। সেখানে হরেন নাকি তাকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

এ-কথায় উমাসুন্দরীর সমস্ত মনটায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল: তিনি বললেন—হরেন নিয়ে গেছে তাকে?

—হ্যাঁ গো, তোমার হরেন।

উমাসুন্দরী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে একেবারে গর্জ্জনের সুর তুলে বল্‌লেন,—মিথ্যে কথা! কে এ-কথা বলেছে, শুনি?

যোগেন মিত্তির একটু থম্‌কে চুপ কোরে রইলেন। উমাসুন্দরীর এমন মূর্ত্তি তিনি আগে কখনো দেখেন্‌নি ত। তখনই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বল্‌লেন,—শশীর কে আপনার-লোক আছে, ট্রেণে সে কোথায় যাচ্ছিল—সেই ট্রেণেই সে হরেন আর কম্‌লিকে এক সঙ্গে কোথায় যেতে দেখেছে।

—শশী বলেছে! একটা বদমায়েস, মাতাল!

—কিন্তু তার এ মিছে কথা বলায় কোনো স্বার্থ নেই ত।

সে-কথা ঠিক! উমাসুন্দরী ভাবলেন, সত্যিই ত! শশী তাঁরই ভৃত্য। তাঁর ছেলের নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়ানোয় তার লোকসান বৈ লাভ নেই! তবে—? তাছাড়া এ-কথাটা আরো পাঁচমুখে এমন করে রটে বেড়াবে কেন? দেশে আরো ত লোক ছিল, কলকাতাতেও লোকের অভাব নেই—কিন্তু এদের সকলকে ছেড়ে তাঁর ছেলে হরেনকেই বা কেন্দ্র করে এই কুৎসার চক্রটা এমন করে লোকে ঘুরিয়ে দেবে কেন? এ কেন'র অর্থ মেলে না যে!

উমাসুন্দরী বল্‌লেন,—তুমি কি করবে এখন?

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন,—কি করব তাও ঠিক করেছি। হরেনকে এখনি আমি চিঠি লিখ্‌ব,—সে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াক্, দাঁড়িয়ে জবাব দিক্, এত লোক থাক্‌তে তার নামে এ অপবাদ ওঠে কেন! তার পর আমি এর বিহিত করব।

উমাসুন্দরী বল্‌লেন,—কিন্তু শোনো, শুধু লোকের মুখে উড়ো কথা শুনে আগে থাক্‌তেই যেন ছেলের সঙ্গে একটা হাঙ্গাম-ফৈজত্ কোরে বোসো না—হাজার হোক্ ছেলে এখন বড় হয়েছে। ত্যাখো, কখনো তোমাকে কোনো কথা বল্‌বার আস্পর্দ্ধা রাখিনি—আজ অনেক দুঃখে এইটুকু মিনতি জানাচ্ছি—আগে সঠিক খপর নাও, তারপর যদি দোষী বোলে বোঝো, তোমার যে-সাজা দিতে মন চায় দিয়ো।

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন,—এর আর কোনো খপরাখপর নেবার দরকার দেখি না। কলকাতার মত জায়গায় ছেলেকে যখন একলা ছেড়ে দিয়েছ, তখন এইরকমই যে একদিন ঘট্‌বে, এ আর আশ্চর্য্য কি! যাক্‌, তোমায় আগে থাকতেই জানিয়ে রাখ্‌ছি—এর পর আমার কাছে কান্নাকাটি করলে চলবে না, আমি তা শুন্‌বও না। হরেনের কাছ থেকে আমি সাফ জবাব চাই! তারপর যা করবার, করবো।

কথাটা বলে যোগেন মিত্তির আর মুহূর্ত্তকালও সেখানে দাঁড়ালেন না—সটান্ দপ্তরখানার দিকে ফিরে চল্‌লেন,—হরেনকে এবার চিঠি লিখ্‌তে হবে।

কর্ত্তা চলে যাবার পর উমাসুন্দরী কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে সেই পূজার আসনের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঠাকুরের সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বল্‌লেন,—হে ঠাকুর, এ দায়ে রক্ষা কর! মার মুখ, মার মান, মার এত-বড় আশা, তুমি আজ রাখো ঠাকুর। মার মুখ এমন করে সত্যিই পুড়িয়ে দিয়ো না যেন!

তাঁর দুই চোখের কোণে অশ্রুর সাগর একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌ল।

৪

ক্ষিতীশ চৌধুরী কপিলডাঙ্গার জমিদারের বংশধর,—কলকাতায় লেখাপড়া করতে এসেছিল। পটলডাঙ্গার একটা গলিতে মাঝারি রকমের একটা ফিট্‌ফাট্ বাড়ী ভাড়া নিয়ে দস্তুরমত ইংরিজী কায়দায়

তাকে সাজিয়ে ক্ষিতীশ সেখানে বাস করছিল আর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এর লেক্‌চারে হাজ্‌রে দিচ্ছিল। বাসায় সরকার বামুন চাকর—এরাই শুধু থাকৃত—তা ছাড়া উপরি লোকের আনা-গোনা এত বেশী আর তাদের কলরবে বাড়ীটা সর্ব্বক্ষণই এমনি সরগরম থাকৃত যে বাইরে থেকে কোনো অজানা লোক তা শুনে ভাবত, বাড়ীতে বুঝি কি একটা সমারোহ ব্যাপার চলেছে।

ক্ষিতীশেয় বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। বেশ সৌখীন ছোকরা। চেহারাখানি চমৎকার, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখের কোণে প্রিঁস্‌নে চশমা। ক্ষিতীশ হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে জানে, গান গাইতে পারে, ছবি আঁকাও তার একটু-আধটু আসে। মস্ত-বড় জমিদার-বংশের দুলাল হলেও সে নেহাৎ একটা ঢ্যাস্‌কা গোবর-গণেশের মত ছিল না। তবে দুর্ব্বলতা যে তার না ছিল, এমন নয়। পাঁচজন সমবয়সীর মুখের তারিফ্‌ শুন্‌তে ক্ষিতীশ ভালো-বাসত—এবং সাদা কথায় যাকে মোসাহেবি বলে, জেনে হোক্‌ আর না-জেনেই হোক্‌, সেটাকে সে মোটেই ঠেলে চল্‌তে পারত না।

অর্থাৎ বন্ধু আর সমবয়সীদের দলে সে মস্ত একজন আর্টিষ্ট বলে পরিচিত হয়েছিল। বন্ধুরা বল্‌ত, তার চুল ছাঁটা কি চাদর নেবার ভঙ্গী থেকে চলা-ফেরার মত তুচ্ছ ব্যাপারে অবধি কেমন একটা কায়দা আছে। ক্যাটালগ দেখে ক্ষিতীশ বোম্বাই থেকে ইবসেন, বার্ণার্ডশ'র বইগুলো যেবার আনিয়ে ফেল্‌লে, সেবার ইবসেনের একখানা বইয়ের পাতা খুলে বন্ধু জগদীশ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো – এই ত আর্টিষ্টের লক্ষণ !

অগাধ প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসে সমস্ত বিশ্বজগৎটা প্রথম যৌবনে তার চোখে এমনি সুলভ হয়ে ধরা দিয়েছিল যে সুলভকে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা তার মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে ত যাচ্ছিলই, তাছাড়া সুলভ বস্তুমাত্রকেই সে বর্জ্জন করতে চাইত।

দেশের বাড়ীতে বিধবা মা আর বয়সে-অনেক-ছোট এক ভাই ছিল। বিয়ে তার এখনো হয়নি। বিধবা মা যেদিন দেখে-শুনে সুন্দরী এক পাত্রী ঠিক করলেন, ক্ষিতীশ সেদিন প্রকাণ্ড একখানা ভারী নভেল শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে ভাব্‌লে, সত্যিই ত, এ কি বিয়ে! জানা নেই, শোনা নেই, বেনারসী কাপড়ের পুঁট্‌লিতে বেঁধে একটি মেয়েকে কোথা থেকে আনা হোল, আর তাকে এমনি ভাবেই পিঠে বেঁধে সারা জীবন-পথটা চলে যেতে হবে! আমার সঙ্গে তার মিল খাবে কি না খাবে, সেটাতে ঘোর সন্দেহ আছে! হয়ত আমি যখন টেনিসন নিয়ে ঐ অসীম নীল আকাশে উধাও হয়ে যাব, তিনি তখন দুই চোখে জল এনে বাপের বাড়ীর পুঁসী বেরালটির জন্যে কাঁদ্‌তে বস্‌বেন! ধেৎ!

মাকে গিয়ে সে বল্‌লে,—বিয়ের এখন কোনো দরকার দেখ্‌চিনে মা। যেদিন দরকার বোধ করব তোমায় বল্‌ব। এখন আমি কলকাতা চল্‌লুম। কাল আমার কলেজ খুল্‌বে।

কথা শুনে মা অবাক! যাই হোক্‌, তিনি আর কোনোরকম উচ্চবাচ্য করলেন না। আকাশের পানে একবার চোখ তুলে চেয়ে শুধু একটা নিশ্বাস ফেল্‌লেন। ছেলে একেবারেই বিয়ে করবে না, এমন কথা বলেনি ত।

কল্‌কাতায় এসে ক্ষিতীশ বন্ধুমহলে এই মতটা রাষ্ট্র করে দিলে যে—আগে থাকতে লভ্‌ না হলে বিয়ে করা চলেই না!

বন্ধু গবেশ ছিল ক্ষিতীশের সব-চেয়ে গোঁড়া সমজদার। তার কারণ, তার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, সেদিকটায় ক্ষিতীশের কাছ থেকে সে দায়ে-অদায়ে বিস্তর সাহায্যও পেত। বেড়াতে বেরিয়েছে হঠাৎ গবেশের জুতো-জোড়াটা ছিঁড়ে গেল—অমনি ক্ষিতীশের এক জোড়া দামী জুতোয় পা ঢুকিয়ে সটান্‌ সেটাকে কায়েমী-ভাবে সে নিজস্ব করে ফেল্‌লে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে ক্ষিতীশের কাছে ছুটে এসে ডাক্তারের ফী, ওষুধের দাম চেয়ে নিয়ে যাওয়া—এগুলোয় কোনদিন কোন ব্যাঘাত ঘটেনি বা ক্ষিতীশ কোন কৈফিয়তও তলব করেনি। নিঃশব্দে সে এ-সবে প্রশ্রয় দিয়েই এসেছে! কাজেই সে-বেচারার তারিফের মাত্রাটা যে সবার চেয়ে বেশী হবে, এ আর বিচিত্র কি।

ক্ষিতীশের কথা শুনে গবেশ বল্‌লে,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গবেশের কিন্তু বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর সে বিয়ের আগে লভের কোন চিহ্নও দেখা যায় নি। কারণ গবেশের স্ত্রীটি এসেছিল একেবারে সেই মগের মুল্লুক থেকে,—যেদিকে গবেশ স্বপ্নেও কোনদিন পদার্পণ করেনি।

গজু বলে উঠল,—তুমি ও-কথা বলোনা হে গবেশ, তোমার মুখে ও-কথা সাজে না! তোমার আগে স্ত্রী, পরে লভ্‌—স্ত্রী-লাভের আগে স্ত্রীর সঙ্গে লভ্‌ নয়।

হেসে ক্ষিতীশ বল্‌লে,—একটু সবুর সইল না হে? গবেশ

ভারী করুণ রকমের একটু হাসি ঠোঁটের আগায় এনে বল্‌লে,—অন্যায় হয়ে গেছে, ভাই!

এমনি মজলিসের মধ্যে থেকে ক্ষিতীশের চিত্ত দুর্লভের পানেই ছুটে চলেছিল—এমন সময় এক নূতন উপসর্গ জুট্‌ল। সে উপসর্গ,—এক মোটর গাড়ী।

পটলডাঙ্গার যে গলিটায় ক্ষিতীশের বাসা ছিল, সেই গলির মোড়েই একজন বাবু একখানা মোটর-গাড়ী কিনে সেটা নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করে বেড়াতে লাগ্‌ল দেখে ক্ষিতীশের এক বন্ধু একদিন বলে উঠ্‌ল—অসহ্য করে তুলেছে ভাই ক্ষিতীশ। তুমি একখানা মোটর না কিন্‌লে আর ভালো দেখাচ্ছে না।

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—আচ্ছা।

তারপর যে-কথা সেই কাজ! এক হপ্তার মধ্যে ষ্টুয়ার্টের দোকান থেকে প্রচণ্ড দামে এক প্রকাণ্ড গাড়ী এল।

তারপর মোটরের নেশা ক্ষিতীশকে এম্‌নি পেয়ে বস্‌ল যে, গান-বাজনা ইবসেন-শ' সব কোথায় পড়ে রইল! যে-জিনিষটা হাতে পাবে সেটার দিকে অসম্ভব ঝোঁক দেওয়া ক্ষিতীশের স্বভাবে রোগের মতই দাঁড়িয়েছিল। মোটর পেয়ে সে এই মোটরকে চালাতে শিখে লাইসেন্‌স নিয়ে নিজেকে একেবারে মোটরে এক্সপার্ট বানিয়ে ফেল্‌লে। যখন-তখন ধাঁ করে মোটর নিয়ে বেরিয়ে কলকাতার এদিকে-ওদিকে চক্র দিয়ে আসা ক্ষ্যাতিকের মত দাঁড়িয়ে গেল। কলেজের লেক্‌চারের দিকে আর মন রইল না। শেষে এই মোটর চালানোর ব্যাপারে একদিন এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেল।

সে-দিন কি-একটা যোগ ছিল ! দেশবিদেশ থেকে যাত্রী এসে কলকাতায় ভারী ভিড় জমিয়ে তুলেছিল। বন্ধুরা সকলেই ভলন্টিয়ারের দলে নাম লিখিয়েছিল,—কাজেই সকলে কাজে বেরিয়েছে। গবেশ চালাক ছোকরা,—সে দলে নাম লেখায় নি। কথায় কথায় নাকি ক্ষিতীশ একদিন বলেছিল,—তোমরা সবাই মিলে দল বেঁধে চল্‌লে হে, আমি একা ঘরে বসে কি করব? আমিও তোমাদের দলে যাই, চল।

বন্ধুরা ভিড় করে সকলে মোটরে চড়ায় আরামের একটু ব্যাঘাত হয়—তাই গবেশ ঠাউরে রেখেছিল, ঐ যোগের দিনটাতে ক্ষিতীশকে নিয়ে সে সাইট-সীইং-এ বেরিয়ে পড়বে। ক্ষিতীশের মুখ থেকে ভলন্টিয়ারের দলে ভেড়বার কথাটা বেরুতেই গবেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল,—নতুন নাম এখন আর নেবে না ত। আমি গিয়েছিলুম,—তা হল না।

কথাটা নিয়ে কেউ যদি তখনি তর্ক তুল্‌ত, তাহলে গবেশকে হেরে মুখ চুণ করতে হত। কিন্তু সবাই তখন নিজেদের ডিউটীর সময়-ক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত, তর্ক তোল্‌বার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। কাজেই গবেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, অর্থাৎ ক্ষিতীশের ভলন্টিয়ারের দলে নাম লেখানো ঘট্‌ল না।

৫

সারা দুপুর এধার-ওধার লোকের ভিড়ে আর পথে গাড়ী চালানোর ব্যাপারে পুলিশের কড়া বন্দোবস্তর ঠেলায়

আহিরীটোলার একটা গলির মধ্যে ক্ষিতীশকে হঠাৎ তার মোটর চালিয়ে দিতে হল। সে-পথে খানিকটা আস্‌তেই সে দেখে, এক দোকানের সামনে লোকের ভারী ভিড়। এটা ত গঙ্গার তীরে যাবার পথ নয়, অথচ এ-পথে এত ভিড় কেন? ক্ষিতীশ মোটর গাড়ীটা আস্তে চালিয়ে এগুতে লাগ্‌ল। গাড়ীতে সঙ্গী ছিল শুধু গবেশ! সে ভাব্‌লে, কোন এ্যাকসিডেণ্ট নয় ত?

এগিয়ে গিয়ে ক্ষিতীশ দেখে, দোকানের রোয়াকে গোলাপ-ফুলের মত রূপে-ঢলঢল একটি মেয়ে—যুবতী কোঁকড়া কালো চুলের রাশ গোলাপের তোড়ার পিছনে বাহারে ফার্ণ-পাতার মত এলানো! রূপে চারিধার আলো হয়ে রয়েছে। যুবতীর মুখে-চোখে জল দেওয়া হচ্ছে। তার মূর্চ্ছা হয়েছে।

ক্ষিতীশ মোটর থেকে নাম্‌তেই দু-এক জন বলে উঠ্‌ল, এই যে, এই একটা মোটর গাড়ী আস্‌ছে,—মোটর। এইতে করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে ত হয়! কেউ বল্‌লে, ছাখো, হয়ত এঁদেরই বাড়ীর মেয়ে। কিন্তু ক্ষিতীশের ভাব-ভঙ্গী দেখে যখন ভিড়ের লোকগুলো বুঝ্‌লে যে, না, মেয়েটি এদের ঘরের নয়, তখন চারিধার থেকে মিনতির ধারা ঝরে পড়ল, ও মশায়,—ওগো বাবু—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও সুরু হল,—কে? যাত্রী বোধ হয়, না? কোথায় বাড়ী, মশায়?—সে-সব গোলমালে এতটুকু চঞ্চল না হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ক্ষিতীশ চোখে যা দেখ্‌লে, তাতে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। এত রূপ মানুষের দেহেও সম্ভব হতে পারে! ক্ষিতীশ তখনি যুবতীর হাতটা নিজের

হাতে তুলে নিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, --পল্‌স্‌ আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে সকলে বলে উঠ্‌ল, -ডাক্তার,—ডাক্তার! বেশ হয়েছে। ভিড়ের দিকে চেয়ে ক্ষিতীশ বল্‌লে, --এঁর বাড়ী কোথায়?

—তা ত জানি না, মশায়।

—আপনার লোকজন এঁর কে আছেন, এখানে?

—কৈ, কেউ নেই।

—কতক্ষণ এম্‌নিভাবে আছেন?

—তা ত জানি না,—পথের উপর পড়োছিলেন—তুলে রোয়াকে আনা হয়েছে। পুলিশে একটা খপর দেব, ভাব্‌ছিলুম সকলে, এমন সময়—

একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনও সেই সঙ্গে ক্ষিতীশের কানে গেল—কি জাত, কি রীতের মানুষ কে জানে! একধার থেকে একটা অভদ্র ইঙ্গিতও ছুটে বেরিয়ে পড়ল। ক্ষিতীশ যুবতীর মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লে! সুন্দর মুখ,—নির্ম্মল--তার মন অমনি বলে উঠল, অসম্ভব। সে ডাকলে,—গবেশ।

গবেশ এগিয়ে এল, এসে বল্‌লে,—কি?

—গাড়ী করে হাসপাতালে নিয়ে যাই, চল। না হলে মারা যাবে।

হাঁ কি না কোন কথাই গবেশের মুখ থেকে চট্‌ কোরে বেরুল না। সে এতক্ষণ অবাক্‌ হয়ে সেই জমাট রূপের প্রতিমার পানেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ ক্ষিতীশের কথায় চমক ভাঙ্গতেই বলে উঠল,—হ্যাঁ।

তারপর সেই বিস্মিত স্তম্ভিত লুব্ধ জনতার মাঝখান থেকে পদ্মবনের পদ্ম ফুলটির মতই সেই রূপসী যুবতীকে দুই বন্ধুতে ধরাধরি করে তুলে মোটর হাঁকিয়ে দিলে।

সেখানে তখন একটা হৈ-হৈ রব উঠ্‌ল। সারা পথটা ক্ষিতীশের মনের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ ছুটেছিল। কি করা যায়? কি—? হ্যারিসন রোডের মোড় পার হয়ে তার গাড়ী ডান দিকে না বেঁকে যখন সোজা শেয়ালদার দিকে চল্‌ল, তখন গবেশ বলে উঠ্‌ল,—এ কি, ক্যাম্বেল চল্‌লে না কি! মেডিক্যাল কলেজে যাবে না? ক্ষিতীশের একটু লজ্জা বোধ হল। তার মুখে প্রথমটা কোন কথা জোগাল না। কোন মতে সঙ্কোচটা কাটিয়ে সে বল্‌লে,—ভদ্দর লোকের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে—হাসপাতালে চট্‌ করে নিয়ে যাব? তার চেয়ে বাসায় নিয়ে যাই। ডাক্তার এনে নার্শ রেখে সেবার বন্দোবস্ত করে দেব'খন—তারপর একটু সেরে উঠলে ঠিকানা নিয়ে ওঁর বাড়ীতে খপর দেব।

বাসায় এসে ক্ষিতীশ বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি রাখ্‌লে না; ডাক্তার ডাকা হল, নার্শ ঝী সবই এল। বাড়ীর দোতলাটা রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হল। বন্ধুদেরও কাজেই উপরে ওঠা বন্ধ হল।

ডাক্তার এসে বলে গেলেন—কোন রকম mental shock এর জন্যে এই রকম হয়েছে। একেবারে অজ্ঞান নয় ত—জ্ঞান একবার-একবার হচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই ভয় তেমন আছে বলে মনে হয় না।

নার্শের সঙ্গে ক্ষিতীশ যুবতীর শিয়রে বসে সারা রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলে। গবেশের থাকা সম্ভব ছিল না; কারণ লভের পূর্ব্বে বিয়ে হলেও তার স্ত্রীটি জীবন্ত ছিল, তা-ছাড়া নবোঢ়াও বটে! কাজেই,—যাক্ সে-কথা!

যুবতীর শিয়রে বসে বসে ক্ষিতীশ কত কথাই যে ভাব্ছিল—মনটাকে কল্পনার ফানুসে চড়িয়ে সে কোন্ অসীম আকাশে ছেড়ে দিয়েছিল! ঐ দুটি মুদিত নয়ন-পল্লবের তলে কি অসীম রহস্য লুকানো আছে। কখন, ওগো কখন্ সেটুকু তার তৃষিত চোখে ধরা পড়বে!

সারারাত কল্পনা কত ছবিই দেখাতে লাগ্ল! সেকালে রাজা-রাজড়ারা বনে মৃগয়া করতে গিয়ে সুন্দরীর দেখা পেতেন আর তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করে একেবারে রাজ্যেশ্বরী করে পাশে বসাতেন। এও যেন সেই রকমেরই ব্যাপার!

ক্ষিতীশ বারবার শয্যায়-শায়িতা মূর্চ্ছিতার পানে চোখের আকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখ্তে লাগ্ল।

বেলা তখন দশটা। মেয়েটি চোখ খুলে চাইলে। নার্শ এসে চামচেয় করে খানিকটা বেদানার রস তার মুখে ঢেলে দিলে। মেয়েটি তার ডাগর দুই চোখে অত্যন্ত কুণ্ঠিত কাতর দৃষ্টি তুলে নার্শের মুখের পানে চেয়ে রইল। এমন কতক্ষণই সে চেয়ে রইল; তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আমি কোথায় আছি?

নার্শ তাকে বেশী কথা বল্তে মানা করলে, বল্লে—আপনি ভালো জায়গাতেই আছেন, কোন ভাবনা নেই।

মেয়েটি বল্‌লে,—আমার বাবা মা কোথায় আছেন? নার্শ এ-কথার জবাব দিলে না। মেয়েটির সম্বন্ধে সে বিশেষ-কিছু জান্‌ত না। তাকে যে কুড়িয়ে আনা হয়েছে, সে যে এ-বাড়ীর কেউ নয়, এ-খপর সে শোনেও নি ত। ক্ষিতীশ অদূরে ইজি চেয়ারে বসে একখানা বই নিয়ে পড়ছিল। নার্শ ক্ষিতীশের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চাইলে। ক্ষিতীশ কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি বল্‌লে,—এটা আপনাদের বাড়ী?

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—হ্যাঁ।

মেয়েটি বল্‌লে,—আমার বাবা মা কোথায় গেলেন?

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—জানি না ত খোঁজ করে বলব'খন। আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না। এখানে আপনার কোন ভয় নেই।

মেয়েটি চুপ করে বিছানাতেই পড়ে রইল। সাম্‌নে খড়খড়ি খোলা ছিল। তারি মধ্যে আপনার অলস দৃষ্টিটাকে বহুদূর বাহিরে সে ছড়িয়ে দিলে। অসীম আকাশ ছেয়ে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই রৌদ্র গায়ে মেখে মাঝে মাঝে দু-একটা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে! আকাশের পানে চেয়ে সে কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল। ভালো করে কিছুই মনে পড়ছিল না। সবটাই যেন আবছায়া! এক তুমুল কলরব তুলে কি মস্ত ভিড় এল—যেন পাহাড়ের মত এক তুমুল ঢেউ—সেই ঢেউয়ে ছিট্‌কে সে যে কোথায় গিয়ে পড়ল! ভিড়টা সরে গেলে সে চোখ

তুলে চেয়ে দেখে চেনা মুখ একটিও পাশে নেই! সমস্ত গা অমনি ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্ল—মাথা ঘুরে গেল—তারপর সাম্‌লে নেবার পূর্ব্বেই সব ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে গেল। মন তার কূল না পেয়ে অকূলে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ল—ক্লান্ত চোখ-দুটিও আপনা আপনি বুজে এল।

... ...

সাত-আটদিন পরে মেয়েটির শরীরের অবস্থা সহজ হয়ে উঠ্ল। সে একটু চলে ফিরে বেড়াতে লাগ্ল। ক্ষিতীশ এতদিন বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়েই দিয়েছিল। দিবারাত্রি এই দোতলাতেই পাশের একটা ঘরে পড়ে থাক্‌ত; মাঝে-মাঝে এঘরে এসেও বস্‌ত। ফুলের গন্ধে লুব্ধ ভ্রমর যেমন গাছের আশেপাশে গুঞ্জন তুলে ফিরতে থাকে, ঠিক তেমনি করেই তার রূপ-লুব্ধ মন এই ঘরটার চারিপাশে ঘুরে বেড়াত; মুহূর্ত্তের জন্যে সে দোতলা ছেড়ে নড়তে পারত না!

দুপুর বেলা মেয়েটি বিছানাতে শুয়ে ছিল, ক্ষিতীশ ঘরে ঢুকে বল্‌লে,—আপনি ভালো আছেন?

মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে উঠে বল্‌লে,—হ্যাঁ?

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—শরীরে একটু জোর পেয়েছেন?

—পেয়েছি।

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—আপনার বাড়ী কোথায় আর আত্মীয় স্বজনই বা কে আছেন? তা ছাড়া রাস্তায়—

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্ল। চারদিকে পাঁচিল ওগো,

চারদিকে পাঁচিল তোলা রয়েছে! পথ কৈ—তার ঘরে যাবার পথ? এ অজানার রাজ্যে এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে তার মন অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিল। তারপর ভবিষ্যৎ—? এখনই বা সেখানে কি হচ্ছে—? কে কোথায় কেমন আছে? কি করছে? তার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ বললে,—কাঁদ্‌বেন না আপনি। আপনার পরিচয় খুলে বল্‌লে আমি খপর দি।

মেয়েটি তখন সব কথা খুলে বল্‌লে—কলকাতার বেশী দূরে নয়, এক পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ী! বাপের সঙ্গে এখানে যোগে গঙ্গাস্নান করতে সে এসেছিল। একটা রাস্তায় খুব ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সে ছিট্‌কে দল থেকে কেমন বেরিয়ে পড়ে। প্রথমটা তার কোন হুঁসও ছিল না। অনেক দূরে এসে ভিড় সরতে সে চেয়ে দেখে, কোথায় বাবা, কোথায়ই বা তার মা! ভিড়ের চাপে চাপে সে একেবারে এ কতদূরে এসে পড়েছে! আজানা মুখ, আশে-পাশে কেবল অজানা মুখ—তাদের সে কত রকমেরই বা ভঙ্গি! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। হয়ত সকলে পিছিয়ে পড়েছে, এই পথেই আস্‌বে,—এই ভেবে মা-বাপের দেখা পাবার আশায় একটা রোয়াকের উপর সে বসে পড়ল। তারপর সমস্ত পৃথিবীটা কেমন অল্পে-অল্পে ঘোর অন্ধকারে ভরে গেল। তারপর যখন সে চোখ চাইলে, তখন দেখে একেবারে এই বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছে। কি করে এল, সে তার কিছুই জানে না!

ক্ষিতীশ বল্‌লে—আপনার বাবার নাম কি?

— শ্রীযুক্ত হরনাথ মৈত্র।

—বাড়ী কোথায় ?

মেয়েটি দেশের নাম বল্‌লে।

—আচ্ছা—বলে ক্ষিতীশ সে-ঘর থেকে উঠে গেল। টেবিলের উপরে কাগজের প্যাড ছিল, তা থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে সে লিখ্‌তে বস্‌ল। লিখ্‌লে,—

মান্যবরেষু

মহাশয়—

একটুকু লিখেই সে চুপ করে বস্‌ল, এ কি করছে সে ? এ-চিঠি লেখার মানে ? তার নিজের চোখের সাম্‌নে থেকে বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শের সব অনুভূতি দুহাতে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে যে! নিজের চোখের দীপটিকে নিভিয়ে ফেল্‌তে বসেছে। এ-কথা মনে হতেই সমস্ত প্রাণটা তার বাণে-বেঁধা হরিণের মত ছটফট করে উঠল! ওগো না, না—এ-চিঠি লেখা যায় না! লেখা হতে পারে না। এ যে নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই হাতে করে সে পরের হাতে তুলে দিতে চলেছে!

আকাশ-পাতাল কত-কি সে ভাব্‌তে বস্‌ল! মেয়েটি তার কেউ নয়! কোনদিন প্রাণের কাছে তাকে পাওয়া যাবে কি না, তাও তার জানা নেই! তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই—প্রাণের একটা কথাও কোনদিন কওয়া হয় নি— তবে—? তবু—এ বড় সুখ। একই ছাদের নীচে দু'জনে আছি ত! এই যে কাছে-কাছে আছি—হাতে না পাই, হাতের

নাগালে আছে, এই চিন্তাটুকুতেও যে মস্ত সুখ! এ সুখ কি ছাড়া যায়! তবুও—চিঠি না লিখেই বা সে করবে কি! কোন্ অজানা ভদ্র ঘরের যুবতী মেয়েকে জোর করে সে আপনার বাড়ীতে বন্দী করে রাখতে পারে না ত!

মেয়েটিকে বিয়ে করলে কি হয়? ঠিক কথা! কৈ, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে কি না, সে-কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি ত! বোধ হয়, বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন দেখা যেত! মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নও ত কৈ নেই! ক্ষিতীশের আশা তবে দুরাশা না হতেও পারে! আহা, এমন কি হবে! কেন হবে না? কোথায় সে এই বাসায় এককোণে পড়েছিল—আর কোথায় সেই আহিরীটোলার কোণে এক অজানা গলি! সে গলির কথা সে জানতও না। তার অদৃষ্ট যখন তাকে সেদিন সেই গলির মধ্যে নিয়ে গেল, তখন সেটার মধ্যে কি কোন উদ্দেশ্য ছিল না! ছিল বৈ কি! একেই বলে, নিয়তি—! নিয়তির গতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই! নিয়তি, অদৃষ্ট—এসব সে আগে মানত না। আজ এক মুহূর্ত্তে দৈবে তার অসীম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল। নিয়তির যদি শক্তি না থাকবে, তাহলে ঘটনাগুলো এমন দাঁড়াবে কেন?

আশার উল্লাসে মেতে ক্ষিতীশ আবার মেয়েটির কাছে এল। বল্লে,—দেখুন, একটা কথা আমি ভাবছিলুম—আপনার বিয়ে হয়েছে ত। তা শ্বশুর-বাড়ী কি কাছে-পিঠে নয়—? আপনার স্বামীকে তা হলে,—

কথাটা সে খুব ভয়ে-ভয়েই বল্‌লে। তার মনে এ বিশ্বাস খুবই ছিল যে জবাব পাবে, বিয়ে আমার হয়নি! হঠাৎ এত-বড় একটি মেয়েকে তার বিয়ে হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন করাটা ঠিক ভদ্রোচিত হবে না ভেবেই সে একটু ঘুরিয়ে ঐ প্রশ্নটাই নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু তার জবাবে যখন শুনলে যে, হ্যাঁ, মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত, তখন মনটা নিমেষে আকাশের উপর থেকে তার রঙীন ফানুস ছিঁড়ে একেবারে কোন্ কঠিন পাহাড়ের গায়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হায়রে হায়, আশার ছোট দীপটি ঝড়ের এক দাপটে নিভে গেল!

খানিক পরে একটা ঢোক গিলে ক্ষিতীশ বল্‌লে,—দেখুন এতদিন ধরে আমার বাসায় আপনি আছেন, আর আপনি বাড়ী না ফেরায় চারধারে একটা গোল পড়ে গেছে, নিশ্চয়। কারণ যখন সেটা পাড়া-গাঁ। তা এমন অবস্থায় আপনার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে সোর-গোল পড়ে যেতে পারে না কি? তা-ছাড়া অর্থাৎ বুঝলেন কি না, নিজে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চুপিচুপি তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌লে ভালো হয় না কি? নইলে নানান্ কথা—

এইটুকু বলে সে চুপ করলে; তারপর দু'বার কেশে ক্ষিতীশ আবার বল্‌লে,—অর্থাৎ বুঝলেন কিনা—এতে আমারও একটা দায়িত্ব আছে কি না। এতদিন কোন খপর দেওয়া হয় নি, হঠাৎ আজ—! তা কলকাতায় আপনার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, যিনি—

মেয়েটি ভাবতে বসল। অনেকক্ষণ ধরেই সে ভাবলে—আর ক্ষিতীশ তার চোখের শেষ দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঘিরে রইল। এ দেখা আর কতক্ষণের জন্যই বা! তার জীবনের পথ থেকে মেয়েটি এখনি চিরদিনের মতই সরে যাবে! তার সঙ্গে কোন কালেও আর দেখা হবার সম্ভাবনা থাকবে না—

হঠাৎ মেয়েটি কথা কইলে। আস্তে-আস্তে বল্‌লে,—দেখুন, কলকাতায় আমার এক দাদা থাকেন, কলেজে পড়েন। খোঁজ করে তাঁকে যদি আনতে পারেন, তাহলে বোধ হয়—

স্পন্দিত বক্ষে ক্ষিতীশ বল্‌লে,—তাঁর নাম কি, বলুন।

—হরেন্দ্রনাথ মিত্তির!

—মিত্তির! আপনার দাদা!

—তিনি আমাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে কি না! আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকেন। কায়স্থ হলেও তাঁরা একেবারে ঘরের লোকের মত।

—কোন্ কলেজে তিনি পড়েন? কোথায় থাকেন?

—তা ত আমি জানি না।

ক্ষিতীশ বল্‌লে,—বেশ, আমি এখনি খোঁজ করতে যাচ্ছি। জমিদারের ছেলে বল্‌লেন না? কলেজে পড়েন? বেশ, কলেজ থেকেই খোঁজ পাব'খন। দেখি। ভালো কথা, তাঁকে পেলে কি বল্‌ব? হরনাথ বাবুর মেয়ে—আপনার নামটি—?—

—আমার নাম কমলা!

ক্ষিতীশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমলা তার উদাস দৃষ্টি

আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, এই ক্ষিতীশের কথা! বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই—অথচ চারিধারে কেমন শৃঙ্খলা! লোকটিকে কেমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই তার মনে হতে লাগল।

৬

কমলার স্বামী সতীশচন্দ্র কলকাতার এক সওদাগরী আপিসের কেরাণী। অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, আয়ও অল্প, এইজন্যে বেচারী বিয়ে করতে বরাবরই একটু নারাজ ছিল। কিন্তু সতীশের মা দুর্গামণি জিদ্ ধরে বসলেন যে বিয়ে তাকে করতেই হবে। ছেলে বিয়ে করবে না, এ আবার কি কথা! সবার ছেলেই যখন বিয়ে করছে, তখন সতীশই না করবে কেন? কৈ, তার পিতৃকুলে কিম্বা মাতুল-গোষ্ঠীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ ত কখনো অবিবাহিত থাকেনি! যার বাপ-দাদারা চিরকাল বিনা-আপত্তিতে বিয়ে করে এসেছে, এমন কি যাদের অনেকে একাধিক পরিণয়েও পশ্চাৎপদ হয় নি, তাদের বংশধর হয়ে সতীশের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হল কেন? সতীশ যদি বিয়ে না করে, তাহলে দুর্গামণির দেহান্তের পর শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যে জ্বাল্‌বে কে? জগদীশপুরের এত দিনের প্রাচীন রায়বংশটা কি সে লোপ করে দিয়ে কুলাঙ্গার হতে চায়?

সতীশ হেসে বল্‌তো,—দেখ মা, অত-বড় কুরু-পাণ্ডবের বংশ, তাও আজ লোপ পেয়ে গেছে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেও

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব

Artistic Press, Calcutta

বহুবংশ রক্ষে করতে পারেন নি! সুতরাং রায়-বংশ যদিই লোপ পেয়ে যায়, তাহলে এমন বেশী কি হবে?

দুর্গামণি ধমক দিয়ে বলতেন,—থাম্ বাপু, তোর ও-সব জ্যাঠামি আমি শুনতে চাইনি। আমি তোর বিয়ে দেবই। তুই বড় বেহায়া, তাই নিজের বিয়ের কথায় কথা কইতে এসেছিস্! আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি তুই তাঁর মুখের ওপর এ-সব কথা কিছু বলতে পারতিস্?

সতীশ ঘাড় হেঁট করে বলতো,—না মা, তা বোধ হয় পারতুম না, কিন্তু পারা উচিত। যে বিয়ে করবে, সকল দায়িত্ব তারই যে। সে দায় সে নিজে বুঝে না নিলে চল্‌বে কেন?

দুর্গামণি বলতেন,—তোর যেমন কথা! বিয়ে করতে আবার দায় কিসের! তুই থাম্! বিয়ে করে বুঝি আবার কেউ অসুখী হয়! দেখিস্ দিকি তোর আমি এমন বৌ করবো যে অনেক রাজ-রাজড়ার ঘরেও তেমনটি মেলেনা!

—তোমার এ মূর্খ গরীব ছেলেকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যে কেউ দেবে না, মা! এই বলে সতীশ হাস্‌তে হাস্‌তে আটটার ট্রেন ধরবার জন্যে ষ্টেশনের দিকে ছুট্ দিত, নাহলে দশটার সময় আপিসে হাজরে দিতে পারবে না।

এমনি করে ছেলের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেক তর্কবিতর্ক করে দুর্গামণি যেদিন পাশের গাঁয়ের মৈত্র-মশায়ের মেয়ে কমলার সঙ্গে সতীশের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন, সতীশ তখন আর সে-বিবাহে অমত করতে পারলে না। যোগেন মিত্রের কাছারী-

বাড়ীতে খাজনা জমা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে সতীশ একদিন জমীদার-বাবুদের বাঁধানো ঘাটে সদ্যস্নাতা কমলাকে দেখে এসেছিল। যৌবনোন্মুখী সুন্দরী কিশোরীর সেই তরুণ লাবণ্য-শ্রী এই বিবাহ-বিমুখ যুবকের অন্তরে অন্তরে সেদিন কী যে মায়াদণ্ডের যাদুস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল তা শুধু সতীশই জানে। বিধবা মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পারার অজুহাতে সতীশ এক কথায় কমলাকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক সতীশের এই অদ্ভুত মাতৃভক্তির প্রশংসা করতে লাগল বটে, কিন্তু সতীশ কমলাকে পেয়ে, বাঞ্ছিত মিলনের সার্থকতায় আপনার দুর্ভাগ্য-পীড়িত জীবনটাকেই একান্ত ধন্য বলে মনে করতে লাগল।

বিবাহের পর ক'টা বছর সতীশের জীবন কে যেন স্বপ্ন-লোকের বিচিত্র আনন্দে ভরে দিয়েছিল। কমলার কমল-চরণ-স্পর্শে জগদীশ-পুরের চির-পরিচিত পুরাতন বাড়ীখানি সতীশের চোখে এক নূতন আনন্দ-রাগে যেন নন্দনের শোভা ধারণ করেছিল! সতীশের মা দুর্গামণি এই সুলক্ষণা মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলেন। তার উপর, কমলা তাঁর সাতরাজার ধন এক মাণিক ছেলেটিকে সুখী করতে পেরেছে দেখে বধূর প্রতি তাঁর স্নেহানুরাগ আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল! শাশুড়ী হয়ে যদি কখনো বৌয়ের আদর, বৌয়ের যত্ন করতে হয়—তবে সে কেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ জগদীশপুরের শ্বশ্রূ-নির্য্যাতিতা তরুণী বধূরা সকলেই সতীশের মা দুর্গামণির উল্লেখ করতে সুরু করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্গামণি তাঁর এই সুযশ বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। কয়েক

বছর কেটে যাবার পরেও কমলা যখন তাঁর কোলে একটি সোনার-চাঁদ নাতি এনে দিতে পারলে না, তখন দুর্গামণি বধূর সন্তান-সম্ভাবনায় ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। কত রকমের ওষুধ-বিষুদ, কবচ-মাদুলি ধারণ করিয়ে, নানা ঠাকুরের দোর ধরেও যখন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল না, তখন দুর্গামণি রায়-বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্যে অধীর হয়ে ছেলের আবার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করচেন, এমন সময় সতীশ পশ্চিম অঞ্চলে একটা মোটা মাইনের চাক্‌রী পেয়ে বিদেশে চলে গেল।

সেখানে পৌঁছোবার দিন দশ-পনেরো পরেই সতীশ হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দুর্গামণি এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে, তাড়াতাড়ি বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, গ্রামের একজন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়কে সঙ্গে করে তিনি ছেলের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সতীশ তখন খতকটা সামলেছে; আপিস থেকেই সে সপরিবারে থাকবার উপযুক্ত একটা বাসা পেয়েছিল, দুর্গামণির এই ছোটখাটো ঝর্‌-ঝরে, তক্‌তকে নতুন বাংলো বাড়াখানি আর পশ্চিমের সেই পাহাড়ে-ঢাকা নদীঘেরা জায়গাটি এত পছন্দ হল যে,সতীশ সেরে ওঠ্‌বার পর তিনি আর দেশে ফিরে যেতে চাইলেন না। আত্মীয়টিকে বিদায় করে দিয়ে সেইখানেই তিনি রয়ে গেলেন, আর বৌমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সতীশকে মহা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সতীশ বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে বৌকে নিয়ে আসবে প্রতিশ্রুত হয়ে দুর্গামণিকে নিশ্চিন্ত করলে।

সতীশেরও এই বিদেশে একলা কিছুতেই মন বসছিল না। কমলার কাছ থেকে দূরে এসে থাকায় যে অপরিসীম কষ্ট, সেইটে এখানে তাকে সদাসর্ব্বদা অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। সুদূর প্রবাসে প্রাণের একান্ত প্রিয়জনটিকে আজ অনেক দিন কাছে না দেখতে পেয়ে সতীশ বড় কাতর হয়ে উঠেছে। কমলার অদর্শন-বেদনা তার অভাবের অসহনীয় দুঃখ একেই সতীশকে ক্রমশঃ এখানে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তার উপর প্রতিদিন দিনান্তে পাওয়া কমলার লেখা একখানি করে চিঠি—যা তার এই সঙ্গীহীন বান্ধবহীন দূর-দেশে জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন ছিল, তাও আজ প্রায় দুসপ্তাহ হল সে একখানিও দেখতে পায়নি। কমলা তার শেষ চিঠিখানায় লিখেছিল যে, তারা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে সকলে মিলে কলকাতায় যাচ্ছে, এখন চার-পাঁচদিন সতীশ যেন তাকে আর কোনও চিঠিপত্র না লেখে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে কমলা সতীশকে চিঠি দিলে,—তবে যেন সে জবাব দেয়। সতীশ সেই চিঠিখানির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। চার পাঁচ দিনের জায়গায় দু হপ্তা কেটে গেল, তবুও কোন খপর না পেয়ে সতীশ বড় উতলা হয়ে উঠলো। প্রথমে কমলার উপর তার দুর্জ্জয় অভিমান হয়েছিল, কেন সে চিঠি দিচ্ছে না! দিনান্তে একখানা চিঠি দিতেও কি সে অপারগ? দেশে না-ই যদি ফিরে থাকে এখনও, কলকাতা থেকে কি আর একখানা চিঠি লেখা চলে না?—জানে তো তার চিঠি পেতে দেরী

দেওয়া দরকার, এ-কথাটা তার একবারও মনে পড়ছে না? আচ্ছা বেশ, দেখা যাক্, সে কতদিন আর এমন চুপ করে থাক্‌তে পারে, আমিও আর তাকে চিঠি লিখ্‌ছিনে। কিন্তু সতীশ তার পণরক্ষা করতে পারলে না, আরও দু-সপ্তাহ যখন দেখতে দেখতে কেটে গেল, সতীশ তখন কমলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলো। এমন তো কখনও হতে পারে না! যে লোক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাকে পত্র লিখ্‌তো, আজ একমাস সে এমন চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয় কমলার অসুখ-বিসুখ করেছে। সতীশ আর অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলে না, সেইদিনই কমলাকে সে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

পত্রের উত্তর আসবার নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেল; কমলার জবাব নিয়ে কোন চিঠিই যখন সতীশের কাছে এসে পৌছল না, সতীশ তখন ভীত হয়ে উঠলো; তাইত, হোল কি ওদের? আজ যে প্রায় একমাস হতে চললো, কোন খবর তাদের পাওয়া যায় নি! সতীশ সেদিন মৈত্র মশায়কে একখানা পত্র দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সেদিনের ডাকে সতীশের নামে একখানা পত্র এল। হাতের লেখাটা অপরিচিত কিন্তু পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে তার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের। সতীশ ব্যস্ত হয়ে চিঠিখানার খাম ছিঁড়ে পড়তে বসলো।

প্রিয় মহাশয়,

বড়ই দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, আপনার স্ত্রী

হরেন্দ্র বাবাজীউর সহিত গত চূড়ামণি-যোগে কুলত্যাগিনী হইয়াছেন। আপনার শ্বশুর মহাশয় সম্ভবতঃ এ দুঃসংবাদ আপনাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী কমলা দেবী ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং দুঃসংবাদ হইলেও সর্ব্বাগ্রে এ ব্যাপার আপনার কর্ণ-গোচর হওয়া বিধেয় বিবেচনায় মহাশয়কে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলাম। যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ইতি।

চিঠিখানা পড়ে সতীশের মাথা ঘুরে গেল, বুকের ভিতর হঠাৎ কে যেন সজোরে একটা লোহার শাবল বসিয়ে দিলে। দু'হাতে নিজের মাথাটাকে চেপে ধরে টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে, খোলা চিটিখানার দিকে সতীশ অনেকক্ষণ পাগলের মত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল!

দুর্গামণি রোজ সতীশের কাছে বৈবাহিকদের খবর পেতেন, সম্প্রতি অনেকদিন হল বৌমাদের কোন খবর না পেয়ে তিনিও একটু উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন। ডাকগাড়ীখানি ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালেই তিনি সতীশকে এসে বলতেন,—ওরে দ্যাখ্ না একবার সতু, উঠে গিয়ে, বৌমাদের খবরটা আজ হয় ত এসেছে। সতীশও উঠে যেত, কিন্তু পোষ্ট অফিস থেকে শুক্‌নো মুখটি নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতো! আজ সে একখানা চিঠি হাতে করে ফিরে এসেছে দেখে দুর্গামণি একেবারে নিশ্চিত অনুমান করে নিলেন যে এবার বৌমাদের খবর না হয়ে আর যায় না। সবিশেষ জানবার জন্যে তিনি যখন সতীশের ঘরে

এসে ঢুকলেন সতীশ তখন চেয়ারে বসেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! ছেলের রকম-সকম দেখে দুর্গামণি মনে মনে শিউরে উঠলেন। খবরটা যে খুবই খারাপ এসেছে, এটা তাঁর বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না, কিন্তু সেটা কি? বৌমার কি তবে ভালো-মন্দ কিছু হয়েছে? দুর্গামণি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ও সতু, অমন কচ্ছিস্ কেন বাবা? তোর শরীরটা কি ভালো নেই? ও কার চিঠি এসেছে? বৌমাদের কি কিছু মন্দ খবর পেয়েছিস্?

সতীশের মুখে কোন কথা নেই, কেমন এক রকম শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তার মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। সমস্ত শরীর তার ঘেমে নেয়ে উঠেছে! দুর্গামণি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে ছেলের মুখখানি মুছিয়ে হাতপাখার বাতাস করতে করতে বললেন,—ওরে, তোর কি হয়েছে, আমায় বল্ না, অমন করে মুখটি বুজে আমার দিকে চেয়ে রইলি কেন সতু? আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা!

সতীশ আস্তে আস্তে টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে তার মায়ের হাতে দিলে। দুর্গামণি বারকতক চিঠিখানা নেড়ে চেড়ে সতীশকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, হায় রে আমার পোড়াকপাল! ওরে, তোর এ অভাগী মা কি লিখ্‌তে পড়তে জানেরে সতু? আমার যে অক্ষর-পরিচয়ও কখনো হয়নি বাবা! তুই একবার পড়ে শোনা, লক্ষ্মী ধন আমার! খবরটা কি, জানবার জন্যে আমার প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছে বাছা!

সতীশ একটা অব্যক্ত যাতনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠ নিয়ে তার মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। দুর্গামণি খানিকটা ভেবে বললেন,—দেখ সতু! আমার বোধ হয় এ কোন শত্রুর কারসাজি, বাবা! আমার এমন লক্ষ্মী প্রতিমের মত বউ, সে কি কখনো এমন কাজ করতে পারে? তুই মৈত্রী মশাইকে একখানা চিঠি লিখে একবার ভাল করে সন্ধান নে, ও বেনামী চিঠি পড়ে মন খারাপ করে থাকিস্ নে বাবা!

জননীর উপদেশ সতীশের সমীচীন বলে মনে হল। সে তখনি উঠে গিয়ে শ্বশুরকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিলে।

৭

ক্ষিতীশ সেই যে হরেনের সন্ধানে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। কমলা উতলা হয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। সহস্র দুশ্চিন্তা আজ তার দুর্ব্বল দেহ-মনকে যেন অস্থির করে তুলেছে। যদি এ বাবুটি হরেনদার সন্ধান না পান, তাহলে উপায়! কেমন করে সে বাড়ী ফিরে যাবে? কে তাকে নিয়ে যাবে? বাবা মা সবাই না জানি তার জন্যে কতই ভাবছেন! চারদিকে কত বোধ হয় খোঁজ হচ্ছে!

কমলা মনে মনে হিসেব করতে বসল, আজ ক'দিন সে বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছে। হিসেব করে বেচারী চম্‌কে উঠ্‌লো! উঃ! আজ যে প্রায় আটদিন হয়ে গেল সে এই অজানা অচেনা একজন পরের আশ্রয়ে পড়ে রয়েছে! ছি ছি! কি

লজ্জার কথা! কি ঘেন্না! গ্রামের লোক শুনলে বল্‌বে কি? ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গৃহস্থের বউ, এতদিন ধরে কলকাতায় এক অপরিচিত লোকের বাড়ীতে বাস করছে, যে তার আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কুটুম্ব নয়, কেউ নয়! যার বাড়ীতে একটা মেয়ে-ছেলে পর্য্যন্ত নেই! কমলা তার এই অসহায় অবস্থার কদর্য্যতাটা যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে নিজেই শিউরে উঠ্‌লো! একটা কলঙ্ক, একটা বদনাম, যে মুহূর্ত্তে রটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় সে একান্ত ভীত হয়ে পড়ল। কত দ্বিধা দুর্ভাবনা সঙ্কোচ যেন সজারুর কাঁটার মত তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ধিক্কারে বিঁধতে লাগল। না, না, আর একদিনও সে এখানে থাকবে না। হরেন-দার সন্ধান পাওয়া গেলে আজই রাত্রে সে তার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।...কিন্তু, যদি হরেন-দাকে না পাওয়া যায়! তাহলে?—তাহলে কি হবে?—সহসা সাঁতার-না-জানা লোকের অতল জলে তলিয়ে যাওয়ার মতো কমলার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে হাঁক্‌পাঁক্ করে উঠ্‌লো। কিছুতেই সে যখন একটা-কিছু কূল-কিনারা ঠাওরাতে পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় ক্ষিতীশ ফিরে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। কমলাকে ডেকে বললে,—দেখুন, হরেনবাবুর কোন সন্ধানই আজ পাওয়া গেল না, তবে আশা হয় যে কাল-পরশুর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবো। গজুকে, গবেশকে, আর আমার অন্য সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে আজ খবর দিয়ে এসেছি, কাল তারা যেমন করে হোক্ হরেনবাবুর সন্ধান করবেই

করবে। আপনি একটুও ভাববেন না। তিনি কোন্ কলেজে পড়েন, সেটা যদি আপনি একটু বলতে পারতেন তাহলে আজই তাঁকে ধরে আনতে পারতুম।

কমলা হতাশ হয়ে বললে,—তা তো আমি ঠিক জানিনি, তবে হরেন-দার কাছে শুনেছিলুম, কলকাতার কোন এক সরকারি কলেজে তিনি পড়েন—সেটা নাকি সহরের ভেতর সব-চেয়ে সেরা ইস্কুল।

ক্ষিতীশ হেসে বললে,—ওঃ! বুঝতে পেরেছি এইবার। এটা যদি আপনি আমায় আগে বলতেন, তাহলে আর আমাকে আজ কলকাতার অর্দ্ধেক মেগ্ খুঁজে বেড়াতে হোত না। তিনি যে কলেজের কথা বলেছেন, আমিও যে সেই কলেজে পড়ি! কাল কলেজে গিয়েই তাঁকে বার করবো এখন। হ্যাঁ, তিনি কি পড়েন, জানেন—?

কমলা তার ছোট মাথাটি নেড়ে বললে, না—তাতো জানিনি! কেবল দু'টো পাশ করে তিনটে পাশের পড়া পড়ছেন, শুনেছি!

—ওঃ, তাহলে বি-এ পড়ছেন বুঝি।

কমলা সাগ্রহে বলে উঠলো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, হরেন-দা এখন বি-এ পড়ছেন।

ক্ষিতীশ বললে,—ব্যস্, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি কালই আপনার হরেন-দাকে নিয়ে এসে হাজির করবো, নিশ্চয়।

কমলা মাথাটা নীচু করে আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে,—আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনো শুধ্‌তে পারবো না।

কমলার এই কটি কথা ক্ষিতীশের অন্তরে যেন একটা পরম সার্থকতার তৃপ্তি ঢেলে দিলে। তার এই তরুণ জীবন আজ যেন ধন্য ও পূর্ণ হয়ে উঠল! সে বেশ প্রীত-প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে,—না, না, এ আর কষ্ট কি!—এ-রকম অবস্থায় সকলেই আপনাকে সাহায্য করতো। বরং এ আমারই খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমিই প্রথম আপনার উপকারে লাগতে পেরেছি। সে যাহোক্ এখন ভালোয় ভালোয় আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারলে বাঁচি! আপনার না-জানি এখানে কত্তই কষ্ট হচ্ছে! আমার এখানে মেয়ে-ছেলেরা কেউ নেই, সমস্তই ঝী-চাকরদের উপর নির্ভর। মোটেই তেমন যত্ন হচ্ছে না।

কমলা ধীরে ধীরে বললে—এর চেয়ে আদর-যত্ন আমি জীবনে কারুর কাছে পাইনি!

ক্ষিতীশের প্রাণের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের মতো আচম্‌কা একটা সুধার ধারা প্রবাহিত হয়ে গেল। কি একটা আবেগের প্রবল বাতাস তরঙ্গ-হিল্লোলের মতো তার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে রোমাঞ্চিত করে তুল্‌লে। মুহূর্ত্তের জন্যে ক্ষিতীশ ভুলে গেল যে কমলা বিবাহিত, আর তার স্বামীও জীবিত। এই

অসামান্য সুন্দরী মেয়েটিকে পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে পর্য্যন্ত, ক্ষিতীশ তার যৌবনের মোহন তুলিকায় প্রতিদিন কল্পনার যে-সব রঙীন ছবি জীবনের অভিনব চিত্রপটে বিচিত্র ভাবের নানা মাধুরী মাখিয়ে আঁকতে সুরু করেছিল, হঠাৎ সেগুলো যেন তখনি সজীব উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার চোখের সামনে বায়োস্কোপের চিত্রের মতো ঘুরে যেতে লাগলো!

কমলা এইসময় আবার অশ্রুজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বললে—আপনার এ উপকার আমি বেঁচে থাকতে কখনো ভুলতে পারবো না!

ক্ষিতীশের তরুণ তনু ঘিরে উচ্ছ্বসিত যৌবনের তরল রক্তস্রোত সহসা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো; সে ফস্ করে বলে ফেললে, আপনাকেও বোধ হয় এ-জীবনে আমি আর কখনো ভুলতে পারবো না! কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু এক দারুণ লজ্জায় তার কাণদুটো পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্লো! কমলার কৃতজ্ঞতার উত্তরে তার এ-কথাগুলো যে নিতান্ত খাপ্ছাড়া আর বেসুরো রকমের হয়ে গেল, এটা তার নিজের কাছেও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাই সে আর কিছু বলতে পারলে না, দোষীর মতোই অপ্রতিভ হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা বেজে গেল। কমলা বললে,—কথা কইতে কইতে অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার এখনো খাওয়া হয় নি। যান, কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নিন্।

ক্ষিতীশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সে নীচেয় নেমে গেল। কমলা উপরের ঘর থেকে শুন্‌তে পেলে, নীচেয় গিয়ে ক্ষিতীশ তার ঝী চাকর বামুন সবাইকে ডেকে কড়া-হুকুম জারি করছে,—খবর্দ্দার, যেন মাই-জীর খাওয়া-দাওয়া-শোওয়ার এতটুকু ত্রুটি না হয়, সবাই হুঁসিয়ার থাকবে, উনি যা হুকুম করবেন তখনি তা তামিল কর্‌বে। ওঁর শরীর খারাপ এটা যেন সকলের মনে থাকে। ইত্যাদি—

৮

ক্ষিতীশ আজ সকাল-সকাল খেয়ে দশটার মধ্যেই কলেজে চলে গেল। যাবার সময় ঝীকে দিয়ে কমলার কাছে বলে পাঠালে যে, কলেজের ফেরৎ একেবারে হরেনকে সঙ্গে করে সে বাড়ী ফিরবে। কমলা তাদের অপেক্ষায় সমস্ত দুপুর-বেলাটা রাস্তার দিকের জানলাটার কাছে বসে কাটিয়ে দিলে। একটা, দুটো করে ক্রমে যখন চারটে বেজে গেল, কমলা তখন বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। আজ এঁর এত দেরী হচ্ছে কেন?—অন্যদিন ত দুটো-তিনটের ভিতরই ফিরে আসেন! তবে কি হরেন-দার ইনি দেখা পান-নি? হরেন-দা কি আজ কলেজে আসেন নি?—নাও আসতে পারেন। হয়ত কোন কাজে হঠাৎ দেশে চলে গেছেন। তা যদি হয়, তাহলে কি হবে? হরেন-দা যদি সত্যিই কলকাতায় না থাকে? কমলা খড়খড়ির পাখিটা তুলে একদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল; প্রাণটা তার ঠিক যেন তখন বাসা থেকে পড়ে-

যাওয়া পাখীর ছানার মতোই ছট্‌ফট্‌ করছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলো, রাস্তার দুধারে সারি সারি গ্যাসের আলোগুলো একটা একটা করে সব জ্বলে উঠ্‌লো। ঝী এসে জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁ মা, আজ কি গা-হাত-পা ধোবেন না, কাপড়-চোপড় কাচবেন না? সন্ধ্যে উত্‌রে গেল যে!

কমলা একটু উদাসভাবে বললে,—না ঝী, আজ আর জল ঘাঁটবো না, শরীরটা ভালো নেই।

ঝী বললে,—তবে আসুন, আপনার চুলগুলো বেঁধে দি। অমন কালো মেঘের মতো একরাশ চুল আজ ক'দিন চিরুণী না ছুঁইয়ে যে জট্‌ পাড়িয়ে ফেললে মা!

কমলা তেমনিই অন্যমনস্কভাবে বললে,—আচ্ছা দাও।

ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করে ঝী যখন সেই চুলের গোছাকে গুছিয়ে তুলে খোঁপা বেঁধে আয়নাখানা কমলার সাম্‌নে ধরলে, কমলা তখন চম্‌কে উঠে বললে,—ও ঝী, সিঁদুর?

ঝী হাস্‌তে হাস্‌তে বললে,—এই যে মা, সব গুছিয়ে এনেছি তোমার জন্যে।

সে তার আঁচলের গেরো খুলে ছোট্ট একটি সিঁদুর-কৌটো বার করে দিলে, কমলা চিরুণীর ধারে খানিকটা সিঁদুর তুলে নিয়ে যখন তার সেই চারু সিঁথির উপর রেখাটুকু টেনে দিলে, তার সমস্ত অন্তরখানি ঘিরে তখন আর একজনের ভাবনা তাকে কাতর করে তুলেছিল!

ঝী চলে গেল, কমলা বসে-বসে ভাবতে লাগল। এ ভাবনাটি

তার মনের গোপন ভাবনা—অষ্টপ্রহর অন্তরের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরছিল; কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। এই অচেনা পুরীতে এমন একজনও সঙ্গিনী নেই, যাকে সে প্রাণের কথা খুলে বলতে পারে। আজ শুধু মনে-হওয়া নয়, মন তার ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌লো স্বামীকে একখানা চিঠি লেখবার জন্যে। কতদিন তাঁকে লেখা হয় নি! এ-কথা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কার কাছ্ থেকে ঠিকানা লিখিয়ে নেবে? বাড়ীতে ঠিকানা লিখে দিত তার ছোট ভাই, এখানে ক্ষিতীশের কাছে তাঁর ঠিকানা লেখাতে তার ভারি লজ্জা বোধ হতে লাগলো। যদি সে জিজ্ঞাসা করে বসে কাকে চিঠি লিখেছে? আর স্বামীর নামটাই বা কি করে তার সাম্‌নে বার করা যায়! কিন্তু আর ত লজ্জা করা চলে না।

কমলা ব্যগ্র হয়ে ঘরের চারদিকে একটা চিঠি লেখবার সরঞ্জাম খুঁজতে লাগলো, কিন্তু ঘরের ভিতর কোথাও সে একটা দোয়াত কি কলম কিম্বা একটুকরো কাগজ পেন্সিল কিছুই দেখতে পেলে না। ক্ষিতীশের টেবিল, চেয়ার, খাতাপত্র, বইয়ের শেল্‌ফ্‌ সমস্তই 'নার্স'রা এসে সে ঘর থেকে কমলার অসুখের সময় বার করে দিয়েছিল।

কমলার মনে পড়লো, ক্ষিতীশবাবু দিন-রাত পাশের ঘরটায় বসেই তো লেখা-পড়া করেন, নিশ্চয় ওখানে কাগজ-কলম পাওয়া যেতে পারে। পাশের ঘরে ঢুকে কমলা দেখলে, সামনেই ক্ষিতীশের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার উপর বেলওয়ারী কাঁচের দোয়াত-কলম সাজানো; একধারে মস্ত-একটা 'রাইটিংকেস্'

রয়েছে। কমলা তার ভিতর থেকে একখানা চিঠির কাগজ বার করে স্বামীকে চিঠি লিখ্‌তে বসলো। চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে কমলা দেখ্‌লে, টেবিলে পাতা ব্লটিং, প্যাডের উপর নীল পেন্সিলে কমলার পিতা মৈত্র-মশায়ের নাম-ঠিকানাটা লেখা আছে, আর তার চার ধারে তার নিজের নামটাও অসংখ্যবার নানা রকম করে লেখা রয়েছে।

সতীশকে চিঠি লিখ্‌তে বসে কমলা ভাবলে, তাইতো, তাঁকে খবর দিয়ে অতদূর থেকে না টেনে এনে বাবাকে কেন একখানা চিঠি দিই না! সেইতো বেশ ভালো হবে। আমাদের গ্রাম শুনেছি কলকাতার খুব কাছে; বাবা চিঠি পেলেই দু'একদিনের মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন, কিন্তু পশ্চিমে ওঁর কাছে চিঠি যেতে আর তিনি আসতে আরও একহপ্তা দেরী হয়ে যাবে, অত দিনতো সে কিছুতেই এখানে থাকতে পার্ব্বে না! কমলা তখন মৈত্র-মশায়কেই চিঠি লিখতে বস্‌লো। প্রায় অর্দ্ধেকটা যখন লেখা হয়েছে,—কেমন করে ক্ষিতীশ বাবু বলে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা থেকে নিজের মোটর গাড়ীতে করে তুলে এনে, আপনার বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করিয়েছেন, এই সব বর্ণনা শেষ করেছে,—এমন সময় ক্ষিতীশের সেদিনকার কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল! ক্ষিতীশ বলেছিল, —কমলা এতদিন বাড়ী ফেরেনি বলে নিশ্চয় তাদের দেশে একটা সোরগোল পড়ে গেছে,—এমন অবস্থায় তার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে একটা উল্টো বিপত্তি হতে পারে, তার চেয়ে কমলার একেবারে

নিজে গিয়ে সমস্ত কথা সেখানে তাঁদের বুঝিয়ে বলাই ভালো, নইলে—-যে সম্ভাবনার তিনি ইঙ্গিত মাত্র করেছেন তা মনে হতেই কমলার হাতের কলম বন্ধ হয়ে গেল। বেচারী তখন গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে বস্‌লো—তাইতো! সে তবে কি করবে? এমন সময় পিছন থেকে চুপি চুপি কে এসে হাত বাড়িয়ে খপ করে তার আধখানা লেখা চিঠিটা তুলে নিলে! কমলা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে—হরেন-দা! সেই তার ছেলেবেলাকার দুরন্ত সঙ্গীটি! চোখে-মুখে সেই চির-পরিচিত দুষ্ট হাসিটুকু আজও তেম্‌নি ফুটে রয়েছে।

কমলা একমুখ হেসে বললে,—আঃ, বাঁচলুম হরেন-দা! তুমি এসেছো দেখে এতক্ষণে আমার মনে একটু ভরসা হচ্ছে! কী বিপদেই যে পড়েছিলুম আমি, সব শুনেছ ত?

হরেন যেন কমলার কোন কথা শুনতেই পেলে না! সে তখন কমলার লেখা সেই অসমাপ্ত চিঠিখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে ব্যস্ত! কমলা বললে,—দেখ, তোমাকে ইনি কলেজ থেকেই ধরে আনবেন বলে গেছ্‌লেন, কিন্তু তোমাদের আসতে এত দেরী হল কেন? আমি সমস্ত দিন কি কষ্টই যে পেয়েছি! ইনি কোথায় গেলেন? তোমার সন্ধান পেলেন কি করে?—তুমি বুঝি আজ কলেজে পড়তে আসোনি, হরেন-দা? দাঁড়াও, দেশে গিয়ে জেঠীমাকে বলে দিচ্ছি!

হরেনের তবুও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তেমনি নির্ব্বিকারভাবেই সে কমলার চিঠিখানা পড়তে অথবা মুখস্ত করতে

লাগ্‌লো। কমলা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে, হরেনের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে,—আচ্ছা হরেন-দা, পরের চিঠি পড়া রোগটা কি তোমার এখনও গেল না? চিরকালটাই এম্‌নি ছেলেমান্‌ষী করবে?

হরেন একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বেশ সহজভাবেই বললে,—তোর কি আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে নারে কম্‌লি? এ বুঝি পরের চিঠি হল? এ-তো তুই লিখেছিস্‌ আমাদের মৈত্র-মশাইকে!

৯

ক্ষিতীশ অনেক কষ্টে সেদিন হরেন্দ্রকে আবিষ্কার করে', নিজে সঙ্গে করেই তাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল; হরেনকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে, চায়ের একটু আয়োজন করবার জন্যে সে নীচেই রইল।—ঠাকুর, চায়ের জল তৈরি আছে? নেই? কেৎলিটা চড়িয়ে দাও চট্‌ করে'। ক' পেয়ালা জল চড়াবে? চড়াও চার পাঁচ পেয়ালার মতন—আজ একটু শীত আছে। রামা, যা ত, তিনকড়ির দোকান থেকে আধ সের রসগোল্লা নিয়ে আয়—বেশ বড় বড় দেখে, বুঝলি? আর ঐ বড় রাস্তার মোড়ে, ক্যালকাটা হোটেল থেকে খানকতক কেক্‌-টেক্‌—এই এক টাকার আন্দাজ, বিস্কুট ত ঘরেই আছে। যাবি আর আসবি—দেরী না হয়।—ইত্যাদি হুকুম জারি করে', ঝিকে দিয়ে পেয়ালা পিরিচ প্লেট ছুরি চামচগুলো সে ধুইয়ে মুছিয়ে চক্‌চকে করে' নিতে লেগে গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দশ মিনিটের মধ্যে সমস্তই প্রস্তুত, চায়ের জলও প্রায় ফটে এসেছে, রামা এখন বাজার থেকে ফিরলেই হয়। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ক্ষিতীশ পায়চারি করতে লাগ্‌ল। দোতলা থেকে মাঝে মাঝে হরেনের উচ্চহাসির শব্দ আসে, আর তার মুখখানি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। মনে মনে সে ভাবে, দুজনে খুব জমে' গেছে, দেখ্‌চি! কমলা আজ আট দিন এখানে রয়েচে, আমার কাছে কোনো দিন কোনো হাসির কথা ত বলেনি। আমার বেলায় কান্না, আর হরেন্‌দার বেলায় হাসি বুঝি! আচ্ছা!

ক্রমে রামা এসে পৌঁছল। প্লেটে প্লেটে খাবারগুলি সাজিয়ে, চা ঠিক করে' সেগুলি নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে ক্ষিতীশ উপরে গেল। দেখলে, তার বসবার ঘরটতে হরেন একখানি চেয়ারে বসে' খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে অনর্গল কথা কয়ে যাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে হাসচে,—কমলা কিছু দূরে একখানি চোড়া চকচকে বেঞ্চিতে বসে' হরেনের মুখের দিকে চেয়ে তার গল্প শুনচে।

ক্ষিতীশকে দেখেই হরেন দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে বল্লে—এই যে, ক্ষিতীশ বাবু যে! আস্তাজ্ঞে হোক্। বসুন, বসুন। ওরে—

হরেনের ভাব-ভঙ্গী দেখে কমলা হেসে ফেল্লে। হরেন বল্লে—কম্‌লি, তুই হাসচিস্ কেন? ভাবচিস্ হরেন্‌দা এমন ব্যবহার করচেন, যেন ইনিই বাড়ীর মালিক, ক্ষিতীশ বাবু অভ্যাগত। তা, আমার কি জানিস্, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু। অর্থাৎ সবাই যেন আমারই মতন ভূত।—বলে' সে হা-হা করে' হাসতে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ অন্য একখানি চেয়ারে বসে' হাসতে চেষ্টা করে' জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের পরামর্শ কিছু স্থির হল?

হরেন বল্লে—কিসের পরামর্শ?

—এই, এঁর সম্বন্ধে। সকল কথা শুনেচেন ত? এখন এঁর কি করা উচিত……

হরেন বল্লে—আমি ত খুব ভাল পরামর্শই দিয়েছিলাম ওকে। তা, ও শোনে কৈ? আজ্‌কাল, কি জানেন ক্ষিতীশ বাবু, মেয়েরা সব হয়েছে স্বাধীন, ওরা এখন নিজের মতে চলতে চায়।—বলে' হরেন মুখখানি বিষম গম্ভীর করে' বসে' রইল।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে কমলার পানে চাইতেই সে বল্লে—না ক্ষিতীশ বাবু, শুন্‌বেন না ওঁর কথা। আসল বিষয়ে কোনও পরামর্শই উনি আমাকে দেন নি। আমি যত জিজ্ঞাসা করি, হরেন্‌দা, কি হবে কি করব একটা কিছু ঠিক করুন, উনি ততই যত সব আজগুবি আজগুবি প্রস্তাব করেন। আপনার আসবার একটু আগেই উনি বল্‌ছিলেন, কম্‌লি, তুই আর দেশে গিয়ে কি করবি, বিলেত যা। রবি বাবুর বই পড়ে' পড়ে' সাহেবরা এখন খুব বাঙ্গলা শিখে ফেলেচে —বিলেত গিয়ে, হিন্দুরমণীর উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়া।—এই রকম এই রকম সব কথা।—বলে' কমলা ঠোঁট দুখানি একটু ফুলিয়ে রইল।

শুনে ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখেও একটু হাসি দেখা দিলে। হরেন বল্লে—মন্দ পরামর্শ দিয়েছি ক্ষিতীশ বাবু? আচ্ছা, এটা

যদি কম্‌লির মনঃপূত না হয়, আরও প্ল্যান আমার মাথায় আছে·········

এই সময় চা আর তার উপকরণগুলি এসে উপস্থিত হল। ক্ষিতীশ বল্লে—আসুন হরেন বাবু, একটু চা খেয়ে নিন, তার পর পরামর্শ হবে।—বলে' দুটি পেয়ালায় সে চা ঢাল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—কম্‌লি, তুই চা খাবিনে?

ক্ষিতীশ বল্লে—উনি ত চা খান না; বলেন, চা খেলে আমার মাথা ধরে।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বল্লে—চা খাস্‌নে? খাওয়া কিন্তু ভাল, যে ম্যালেরিয়ার দেশে থাকস্‌। আচ্ছা, চা না খাস, দুটো রসগোল্লা খাবি আয়। আয়, হাঁ কর্‌, টুপ করে' মুখে ফেলে দিই। এস, লক্ষ্মী দিদি এস।

কমলা বল্লে—হরেন্‌দা যে কি বলেন তার ঠিক নেই! এখনও উনি আমাকে সেই ছোট্টটি মনে করেন!

হাসি গল্পের মধ্যে চা খাওয়া শেষ হল। তখন প্রায় ছ'টা—শীতকাল, অন্ধকার হয়ে এসেচে। ক্ষিতীশ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেচে যে হরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে' কমলা যে একটা কিছু ঠিক করে' নেবে, তার আশা নেই, কারণ হরেন ওর সকল কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তাকেই সে-কাজ করতে হবে। আর, পরামর্শটা কমলার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল। তাই সে প্রস্তাব করলে—চলুন হরেন বাবু, গড়ের মাঠে গিয়ে একটু

বেড়ানো যাক্। সেই খানেই ভেবে-চিন্তে একটা কিছু পরামর্শ স্থির করা যাবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেচে? ছ'টা প্রায়। আচ্ছা চলুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্ষিতীশের মোটর গাড়ী আস্তাবল থেকে এসে, বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল।

মনুমেণ্টের কাছে পৌঁছে, গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজনে মাঠে প্রবেশ করলে। কিছুদূর যেতেই, একটা গাছের তলায় একখানি খালি বেঞ্চি পাওয়া গেল। দুজনে তাতে বসে' কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে।

ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু, আপনি কমলার গ্রামের লোক। ওঁর বাপ-মাকেও জানেন, গ্রামের লোকদেরও জানেন। এই এতদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর, আপনি যদি ওঁকে নিয়ে গিয়ে দেশে রেখে আসেন, তা হলে কি রকম হয় বলুন দেখি?

হরেন বল্লে—বড় সুবিধে হয় না। দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ও ছিল কোথায়? ওকেও জিজ্ঞাসা করবে, আমাকেও করবে। ওর বাবাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার সময় আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হবে।

ক্ষিতীশ বল্লে—তা হলে উপায় কি এখন? ওঁর স্বামীকে চিঠি লিখে এখানে আনানো যাবে?

হরেন প্রায় এক মিনিট কাল চুপ করে' থেকে বল্লে—তিনি এসে দেখবেন, তাঁর যুবতী সুন্দরী স্ত্রী রয়েচে একজন যুবাপুরুষের বাসায়, সেখানে আর কোনও মেয়েছেলে ত নেই-ই,

তার কোনও পুরুষ আত্মীয় অভিভাবক নেই। এক আধ ঘণ্টা নয়—দশ বারো দিন······

ক্ষিতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—ঐটে বড্ড ভুল হয়ে গেচে।

—তা হয়েচে। প্রথমে যা ভেবেছিলেন, মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে যদি নিয়ে যেতেন, তা হলে আর এই সমস্যাটি উপস্থিত হত না।

—তখন ও কথাটা আমার মোটেই মাথায় আসেনি, হরেন বাবু। আমি ভাবলাম, ভদ্রঘরের মেয়েকে নেহাৎ হাসপাতালের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট করে' দেওয়াটা, বিশেষ ঐ বয়সের মেয়ে······

—সে ত নিশ্চয়। আপনি তখন যে দিক্ থেকে দেখেছিলেন, ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু···সে যাক্ এখন আর অনুশোচনায় ফল কি ?

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে নানা রকম উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলে, কিন্তু কোনটাই মনোমত হল না; একটা একটা করে' সবগুলোকেই বাতিল করে' দিতে হল।

তার পর কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে বসে' রইল।

শেষে হরেন বল্লে—দেখুন, আপনি আর আমি, দু'জনে পরামর্শ করে' এর কোনও কূলকিনারা পাব না। এই পরামর্শের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা আবশ্যক।

—কে সে তৃতীয় ব্যক্তি ?

—আমাদের মৈত্র মশায়—কমলার বাপ। বিশেষ জরুরী

কাজ আছে বলে'—আর কিছু না বলে'—চিঠি লিখে তাঁকে আনাই। তিনি এলে, সব কথা তাঁকে খুলে' বলি। তিনি বাপ ত, নিজের সন্তানকে তিনি ত ভাল রকমই জানেন, তাঁর মেয়ে যে কোনও অন্যায় করেচে, এ সন্দেহ, আশা করি, তাঁর মনে কখনই হবে না। বাকী থাকে গ্রামের লোক—সমাজ। কি উপায় অবলম্বন করলে, তাদের নখ-দন্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা যায়, সে পরামর্শ আমরা তাঁরই সঙ্গে করি আসুন।

ক্ষিতীশ কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বল্লে—এ পরামর্শ মন্দ নয়, বিশেষ যখন এ ছাড়া অন্য কোনও পথ এখন নজরে আসচে না। কিন্তু আপনি তাঁর কাছে যতটা উদারতা আশা করচেন, সেটা কি বেশী হচ্চে না? মনে রাখবেন, তিনি সেকেলে লোক। ইংরেজিওয়ালা নন, চাণক্যশ্লোকওয়ালা। 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' স্কুলের লোক। তার চেয়ে বরং কমলার স্বামীকে বিশ্বাস করানো সহজ হতে পারে যে…

হরেন বল্লে—কিন্তু আরও একটা দিক ভেবে দেখুন ক্ষিতীশ বাবু। সতীশ বাবু—অর্থাৎ কমলার স্বামী—তিনি দেখবেন প্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে, যার কাচ দুখানি খুব অল্পেই জেলসিতে ঘোলা হয়ে যেতে পারে। বাপ দেখবেন অপত্যস্নেহের চক্ষে—সে চোখ দুটি এমনি যে, খারাপ দিকটে ভাল নজরেই আসে না, ভাল দিকটে খুব উজ্জ্বল হয়েই দেখা দেয়।

ক্ষিতীশ বল্লে—এটা ঠিকই বলেছেন।

—আর, আপনি যা আশঙ্কা করচেন ক্ষিতীশ বাবু, মৈত্র মশায়

যদি তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় সন্দেহই করেন, সমাজের ভয়ে তাকে ঘরে না নিয়ে যেতে চান, তখন কমলার স্বামী ত' আছেই—তাকে খবর দিয়ে আনানো যাবে।

—আচ্ছা, তবে সেই পরামর্শই ভাল। মৈত্র মশায়কে আপনি চিঠি লিখুন। তিনি যতদিন না আসছেন, ততদিন কমলা……কোথায় থাক্‌বেন ?

—আপনার বাসাতেই, যেমন আছে, তেমনিই থাকুক।

শুনে, ক্ষিতীশ একটু স্বস্তিবোধ করলে। কথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় তার মনে একটু ভয়ই ছিল, হয়ত হরেন তার কোনও বন্ধুবান্ধবের পরিবারের মধ্যে কমলাকে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার প্রস্তাব করবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেছে দেখুন ত ক্ষিতীশ বাবু।

ক্ষিতীশ মুখের সিগারেটে জোরে দুই তিন টান দিয়ে, সেই আগুনের কাছে নিজের হাতঘড়িটি তুলে বল্লে—পৌনে আটটা।

—তবে এখন ওঠা যাক্, চলুন, ঐ পরামর্শই রইল।—বলে, হরেন দাঁড়িয়ে উঠল! ক্ষিতীশও উঠে, দুজনে আস্তে আস্তে রাস্তায় যেখানে মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল।

কাছে আসতেই, শোফেয়ার নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু উঠুন।

হরেন বল্লে—না মাফ্‌ করবেন, আমায় এখন বাসায় যেতে হবে।

—কমলার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন না? পরামর্শ যা হল, তাঁকে ত বলা উচিত।

—আপনিই বল্‌বেন, ক্ষিতীশ বাবু। আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। বাসায় গিয়ে, কাপড় বদলে, সেখানে যেতে এমনিই দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্কার—বলে' হরেন ট্রামের চৌমাথার দিকে অগ্রসর হল।

ক্ষিতীশ বল্লে—আমার গাড়ীতেই আসুন না। আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই।

—আপনার ঘুর হবে না?

—হলই বা একটু ঘুর। আসুন।—বলে' ক্ষিতীশ হরেনের হাত ধরে' গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে, আপনি উঠে বস্‌ল।

গাড়ীতে ক্ষিতীশ হরেনকে বল্লে—দেখুন, চিঠিখানা রেজেষ্ট্রি করে' দেবেন। কারণ সেটা পাড়াগাঁ। পিয়ন কার চিঠি কাকে দেয়, তার ঠিক কি? যতটা সম্ভব, ব্যাপারটা এখন গোপন রাখাই দরকার কি না।

—ঠিক বলেছেন। রেজেষ্ট্রি করেই পাঠাব।

—আর, খামের উপর, ফ্রম-ট্রম্ কিছু লিখে দেবেন না। রাস্তায় পিয়নের হাত থেকে কে সে চিঠি নিয়ে দেখ্‌বে! মেয়ে-হারাণো মৈত্রী মশায়ের নামে,আমাদের জমিদার-পুত্র হরেন বাবু এক রেজেষ্ট্রি চিঠি লিখেছেন—পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কল্পনাশক্তিটে যে-রকম প্রবল, কি সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়ে তাই প্রচার করে বেড়াবে তার ঠিক কি? পাড়াগাঁয়ের লোককে ত চেনেন।

বলতে বলতে গাড়ী এসে বউবাজারে হরেনের বাসার সামনে দাঁড়াল। হরেন গাড়ী থেকে নেমে বল্লে—আচ্ছা, ও-সব কিছু লিখ্‌ব না। এখন আসি তা হলে—গুড্‌নাইট্‌।

—গুড্‌নাইট্‌। চালাও।

মোটর গাড়ী গর্জ্জন করে' উঠল।

১০

গাড়ী গলির মোড় পার হয়ে বউবাজারের রাস্তায় এসে পড়ল। ক্ষিতীশের মনে হল—কৈ, হরেনকে ত কাল, কি পশু´, কি মাঝে মাঝে, আমার বাসায় এসে কমলার খবর নিতে বল্লাম না। ভুল হয়ে গেছে—তা যাক্‌গে। ও আপনিই আসবে'খন—অবসর পেলেই আসবে, বোধ হয়।

গাড়ী বড় রাস্তায় যখন এসেছে, ক্ষিতীশ তখন মনে মনে একটা হিসাব করতে আরম্ভ করেছে। আর ক'দিন? কাল হরেন কমলার বাপকে চিঠি লিখবে—একদিন। তিনি সে চিঠি পশু´ পাবেন—পশু´ই পাবেন কি? পাড়াগাঁয়ের পোষ্ট আপিস, তুই একদিন দেরী হলেও হতে পারে;—কিন্তু জায়গাটাও কল্‌কাতা থেকে বেশী দূরে নয়। আচ্ছা, পশু´ই না হয় তিনি চিঠি পেলেন—ছ'দিন। তার পর দিন, তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন—কলকাতায় এসে পৌছলেন—তিন দিন। তার পর দিন, কমলাকে নিয়ে তিনি—দেশেই হোক আর যেখানেই হোক—চলে গেলেন—চার দিন। সুতরাং, এই চার দিন মাত্র কমলাকে

দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তার পর? তার পর—আর কোনো দিন না, এ জীবনে না।—ক্ষিতীশের বুকটি কাঁপিয়ে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল।

পটলডাঙ্গায় নিজের বাসায় পৌঁছে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে খানিক উঠেই ক্ষিতীশ দেখলে, তার বসবার ঘরে কমলা টেবিলের কাছে ঝুঁকে বসে একখানি বই হাতে করে পড়ছে। সে সিঁড়ি উঠে বারান্দায় দাঁড়াল—কিন্তু কমলা এত নিবিষ্ট চিত্ত যে, ক্ষিতীশের পায়ের শব্দ তার কাণে গেল না। সমুখে বিদ্যুতের টেবিল-বাতিটি জ্বলছে, আর কমলার মুখে পড়ছে, বাতির উপরকার সবুজ শেডের ভিতর দিয়ে 'ছেঁকে বেরিয়ে আসা সেই মরকত প্রভাটুকু। সেই কোমল প্রভায়, কমলার মুখখানি বড় শীতল, বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ দেখাচ্চে। ক্ষিতীশ মুগ্ধ হয়ে সেই মুখশোভা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় আধ মিনিটকাল দেখে, একটি মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বল্লে —আর চার দিন।

ক্ষিতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কমলা চম্‌কে উঠে, চোক তুলে, বই খানি টেবিলের উপর ফেলে বল্লে—এসেছেন? হরেন-দা কৈ?

এই প্রশ্নে—হরেন-দার জন্যে এই আগ্রহে—ক্ষিতীশের মনটি একটু ব্যথিত হল, কিন্তু সে নিজেকে তখনি সামলে নিয়ে বল্লে—তিনি এলেন না। বল্লেন, কোথায় তাঁর নেমন্তন্ন আছে।—বলতে বলতে টেবিলের এধারের একখানি চেয়ার টেনে সে বস্‌ল।

কমলা মুখখানি নীচু করে কি ভাবতে লাগ্‌ল। শেষে বল্লে—আপনাদের পরামর্শ কিছু ঠিক হল?

—হ্যাঁ, হয়েছে একটা।

পরামর্শ যা হয়েছিল, ক্ষিতীশ সংক্ষেপে তা কমলাকে জানালে।

শুনে কমলা বল্লে—হ্যাঁ, সেই বোধ হয় বেশ হবে। বাবা আসুন—তিনি এলে আর কোনও ভাবনা নেই।

—তিনি রাগ টাগ করবেন না ত?

—রাগ করবেন? আপনাকে তিনি কত আশীর্ব্বাদ করবেন। আপনি না থাকলে, তাঁর মেয়ে কি এতদিন বাঁচত? মরে যেত। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার উপর তিনি রাগ করবেন? কখনই না।

একটু আগে ক্ষিতীশের মনের সে দুঃখটুকু এই কথাগুলি শুনে ধুয়ে মুছে গেল। কমলার বাপ মার কথা, তার ছোট ভাইটির কথায় দুজনের গল্প বেশ জমে উঠল। গ্রামের লোকের কথার প্রসঙ্গে কমলা বল্লে—চিঠিখানি ভালয় ভালয় এখন বাবার হাতে পৌছলে বাচি!

ক্ষিতীশ বল্লে—সে-কথা আমরা আগেই ভেবেছি। হরেনকে বলেছি, চিঠিখানি রেজিষ্ট্রি করে পাঠাতে।

—রেজিষ্ট্রি চিঠি? কিন্তু কাল ত রবিবার। রবিবারে কি এখানে রেজিষ্ট্রি চিটি পাঠানো যায়? আমাদের গ্রামের পোষ্ট আপিসে ত নেয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—ঠিক ত। কাল যে রবিবার তা আমাদের কারু খেয়ালই হয় নি। না, কাল রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো যাবে না। যাক্—আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল।

শেষের কথাটা বলে ফেলেই ক্ষিতীশের মনে হল—যাঃ, এ কি করলাম? তার মনটি ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

কমলা এক দৃষ্টে ক্ষিতীশের মুখের পানে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে—একটা দিন কি পাওয়া গেল?

ক্ষিতীশের মাথাটার ভিতরে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সে বল্লে—একটা দিন? ওঃ—এই—ইয়ে অর্থাৎ পরামর্শ টরামর্শ করবার জন্যে আরও একটা দিন—

ওঃ—বলে' কমলা একটু যেন সন্দেহের চোখে চেয়ে রইল। ক্ষিতীশ হঠাৎ উঠে বল্লে—উঃ, রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে, রোগা মানুষ, আপনার এখনও খাওয়া হল না! রান্নার কি দেরী, দেখি।—বলে' চটপট্ সে নীচে নেমে গেল।

কমলা টেবিলের উপর কুনুই রেখে, গালে হাতটি দিয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল।

একটু পরে ঝী এল, পাশের ঘরে কমলার জন্যে ঠাঁই করে' দিলে। বামুন থালায় করে' খাবার বেড়ে নিয়ে এসে সেই ঘরে ঢুকলো। ক্ষিতীশ এসে বল্লে আপনার খাবার দিয়েচে, যান, খেয়ে নিন—খেয়ে শুয়ে পড়ুন গে।

খাবার-ঘরের ও-পাশের ঘরখানিতে কমলার বিছানা। ঝীও সেই ঘরে শোয়। এ কদিন রাত্রে খাবার পরে, কমলা একেবারে

সেই ঘরে গিয়ে ঢোকে. এ-দিকটায় আর আসে না, ক্ষিতীশের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—খাবার দিয়েচে, যান।

—যাচ্চি।—বলে' কমলা মুখখানি নীচু করে' রইল। ঝী এসে বল্লে—দিদিমণি আসুন।

—চল ঝী, যাচ্চি এখনি।

ঝী চলে গেল। কমলা বল্লে—আপনি কখন্ খাবেন? আপনি কেন আগে খেয়ে নিন না।

—আমার খেতে এখনও দেরী আছে। এই ত সবে ন'টা। আপনি রোগা মানুষ, আপনি দেরী করবেন না। যান, লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।

—যাই।

কমলা মুখে বল্লে যাই, কিন্তু উঠল না। মুখখানি নীচু করে' কি ভাবতে লাগ্‌ল! তার পর হঠাৎ মুখ তুলে বল্লে—আপনি—একটি—অধিকার আমায় দেবেন?

—কি, বলুন।

—আজ থেকে, আমি আপনাকে দাদা বলব। আপনি মনে করতে পারেন, এত দিনের পর হঠাৎ এর এ খেয়াল কেন? তা বলি। আপনি যখন আমার হরেন-দার বন্ধু হলেন, তখন আমারও দাদা হলেন। হলেন কি না?

ক্ষিতীশ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—হলাম বোধ হয়।

কমলা বল্লে—তবু 'বোধ হয়'? কেন, আপনার ত কোনও বোন নেই; মানুষের একটা বোন থাকা উচিত ত।

—তা উচিত বোধ হয়।

—সব কথাতেই আপনার 'বোধ হয়'!—আচ্ছা, এখন থেকে আমিই আপনার সে বোন্ হলাম। ঠিক ত?

—ঠিক।

—আচ্ছা বেশ। আর একটা কথা। আমি যখন আপনার ছোট বোনটি হলাম, আপনি আমায় আর 'আপনি' বলে কথা কবেন না।

—বেশ, তাই হবে। যাও, এখন যাও খেতে বস।

—যাই দাদা।—বলে' কমলা উঠে গেল।

মাঝের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, ক্ষিতীশ চেয়ারে বসে' গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

১১

তিন দিন পরে, রাত্রি দশটার সময় ক্ষিতীশ বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মৈত্র মশায়ের খবর কি? তিনি এসেছেন?

—না।

—চিঠিখানা ঠিক পাঠানো হয়েছিল ত?

—হাঁ, হয়েছিল বৈকি। কিন্তু তার পরদিন ছিল রবিবার—সেদিন হল না। কাল সোমবারে চিঠি রেজিষ্ট্রি করে' পাঠিয়েছি।

—এখান থেকে চিঠি লিখলে আপনাদের গ্রামে কবে পৌঁছয় ?

—আজ লিখলে কাল পৌঁছয়।

—তা হলে, আজ তিনি সে চিঠি পেয়েছেন। গাড়ী কখন ? আসবার সময় কি তাঁর হয় নি এখনও ?

—বেলা দশটার সময় আমাদের গ্রামে চিঠি বিলি হয়। চিঠি পেয়েই যদি তিনি রওয়ানা হতেন, এতক্ষণ এসে পৌঁছতেন বৈকি !

—কাল আসতে পারেন।

—হয়ত গ্রামান্তরে কোথাও গেচেন, বাড়ী নেই। বাড়ী এলে চিঠি পাবেন। দুই একদিন দেরীও হতে পারে। কমলা কেমন আছে ?

—ভালই আছেন। আপনি ত কৈ আর তাঁকে দেখতে টেখতে আসেন না !

—সময় পাইনি ক্ষিতীশ বাবু। কাল কি পশু´ বিকেলের দিকে একবার যাব এখন। আপনি বাড়ী থাক্‌বেন ত ?

—হ্যাঁ, থাকব বৈকি। আসবেন তা হলে। এখুন তবে উঠি—নমস্কার !

দু'দিন পরে হরেন্দ্র ক্ষিতীশের বাসায় এসেছিল, কিন্তু মৈত্র-মশায়ের কোনও সংবাদই দিতে পারেনি। দিনের পর দিন কাটতে লাগ্‌ল, সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, কিন্তু তবু কোনো সংবাদ নেই। কমলার আড়ালে, ক্ষিতীশ হরেন দুজনে বসে' এ বিষয়ে

নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না। চিঠি রেজিষ্ট্রি হয়েছে বলেই যে সে অমর, তা ত নয়—সেও ত মারা যেতে পারে। পূর্ব্বের চিঠিখানি ডাকে মারা গেছে অনুমান করে', হরেন ঠিক সেই রকম আর একখানি চিঠি লিখে রেজিষ্ট্রি করে' পাঠালে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথম চিঠি লেখবার পর তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল, তবু কোনও সংবাদ নেই।

কি করা এখন উচিত, রোজই এ বিষয়ে জল্পনা হয়—কিন্তু কিছুই স্থির হয় না। এক মাসের উপর কমলা এখানে রয়েছে। সে এখন কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। ক্ষিতীশ যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। হরেনও মাঝে মাঝে এসে তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কমলা বলে, আমার বাবা বোধ হয় বেঁচে নেই, থাকলে তিনি নিশ্চয়ই আসতেন, অন্ততঃ চিঠির উত্তরও আস্‌ত।

প্রথম চিঠিখানি লেখবার ঠিক একটি মাস পরে, বেলা তিনটার সময় হরেন ছুটতে ছুটতে ক্ষিতীশের বাসায় এসে তার হাতে একখানি সরকারী লম্বা লেফাফা দিয়ে বল্লে—ওহে, এই দেখ।

এক মাসে দুজনে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, 'আপনি' 'মশাই' উঠে গেছে।

ক্ষিতীশ দেখলে, সেখানি ডেড্ লেটার্স আফিস থেকে এসেচে। ভিতরে হরেনের সেই প্রথম লেখা চিঠিখানি। তার পিঠে স্থানীয় পিয়ন মশায় স্বহস্তে লিখেছেন—

মালিক কলিকাতায় গমোন করিয়াছে মতে ডিপোজিট।

নীচে একটা তারিখ লেখা আছে। তার নীচে, আর এক সপ্তাহ পরে তারিখ দিয়ে উক্ত পিয়ন মশায়ের দ্বিতীয় মন্তব্য—

মালিক এখনো কলিকাতা হইতে আসে নাই কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না মতে ফেরৎ।

সেদিন হরেন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ক্ষিতীশের বাসায় রইল। কমলার সঙ্গে তার এই পরামর্শ স্থির হল যে, এখন তাকে লক্ষ্ণৌয়ে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

ক্ষিতীশ বল্লে—তবে তাই নিয়ে যান। সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলে', ওকে রেখে 'আসুন।

হরেন বল্লে—কিন্তু আমি একলা গেলে ত চল্‌বে না ভাই, তোমাকে শুদ্ধ যেতে হবে। কি অবস্থায় কমলাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে, কি কারণে এই দীর্ঘকাল এখানে থাকতে ওকে বাধ্য হতে হল, এ সমস্ত কথা তোমার মুখেই সতীশ বাবুর শোনা উচিত। ব্যাপারটি যে-রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সাক্ষী প্রমাণ ভাল রকম করে' দেওয়াই দরকার।

ক্ষিতীশ রাজী হল, কিন্তু বল্লে—এখন ত আমার কলেজ কামাই করলে চল্‌বে না ভাই! একেই আমার পার্সেণ্টেজ শর্ট পড়ে গেছে। সাম্‌নের সপ্তাহে শুক্র শনি দু'দিন ঈদের ছুটি রয়েছে, রবিবারটাও পাওয়া যাচ্ছে, সেই সময় ঠিক হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মেলে রওনা হয়ে, শুক্রবার সেখানে পৌঁছে, রবিবার সেখান থেকে ছেড়ে, সোমবারে এসে আবার কলেজে হাজ্‌রে দিতে পারব।

সেই পরামর্শই রইল। সতীশ বাবুকে আগে থেকে চিঠি লিখে কিছু না জানানোই স্থির হল।

যাত্রার দিনে বিকেলে ঝী যখন কমলার চুল বেঁধে দিচ্ছিল তখন তার চোখ ছুটি দিয়ে টপ্ টপ্ করে' জল পড়তে লাগ্ল। ঝী বল্লে— কেন দিদিমণি, কাঁদচ কেন?

কমলা বল্লে—যাচ্চি ত ঝী! কিন্তু কপালে কি যে আছে তা ত জানিনে!

ঝী বল্লে—কপালে কি আর থাকবে? এমন সতী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, তোমার কপালে ভালই আছে।

বম্বে মেলে, যে গাড়ীখানি মোগলসরাইয়ে কেটে নিয়ে আউধ রোহিলখণ্ড রেলের ডাক গাড়ীতে জুড়ে দেয়, অর্থাৎ মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদলাবার জন্যে নামতে হয় না, সেই গাড়ীতে ক্ষিতীশ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে' রেখেচে। সন্ধ্যার পর, ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে যাবে।

সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, দুজনে যখন বেরুবার উদ্যোগ করছিল, তখন হঠাৎ ক্ষিতীশ কলিকাতাবাসী তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলে। বিশেষ প্রয়োজনে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যে তিনি ক্ষিতীশকে দেখা করতে বলেছেন।

তাই ত! ঘড়ি খুলে ক্ষিতীশ দেখলে, সেই যোড়াসাঁকোয় গিয়ে আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা করে' ফিরে এসে রওয়ানা হ'তে

হলে দেরী হয়ে যাবে, ট্রেণ ধরা যাবে না। তখনই তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। চাকরকে বলে দিলে—বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া একটা ট্যাক্সি ধর।

পাঁচ মিনিট পরে চাকর এসে খবর দিলে—ট্যাক্সি এসেচে হুজুর।

ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে নীচে নামল। তার নিজের মোটর গাড়ী, আর এক ট্যাক্সি, দুখানিই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কমলাকে নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে শোফেয়ারকে বল্লে—এঁকে বউবাজারে হরেন বাবুর বাসায় নিয়ে যাও। হরেন বাবুকে তুলে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাবে। আমি একটা কাজ সেরে, এই ট্যাক্সিতে হাওড়ায় গিয়ে ঠিক সময়ে পৌছব।

ক্ষিতীশের গাড়ী, কমলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সি যোড়াসাঁকোর দিকে ছুটল।

যোড়াসাঁকোর কাজটুকু সেরে, ক্ষিতীশ ট্যাক্সিতে ফিরে এসে বল্লে—জোরসে হাঁকাও।

বম্বে মেল ছাড়বার আর পনেরো মিনিট তখন আছে। ট্যাক্সি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

হাওড়া পুলের কাছাকাছি এসে, একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে ক্ষিতীশের ট্যাক্সির ধাক্কা লেগে গেল। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাড়ীর ভিতর থেকে দুজন প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক নেমে রাস্তায় দাঁড়ালেন। দুই গাড়োয়ানে মহা গালাগালি। লোক জমে গেল। পুলিস

এসে ঝগড়া থামিয়ে দুই গাড়ীরই নম্বর টুকে নিলে। ক্ষিতীশের নাম ঠিকানা লিখে নিলে। ভাড়াটে গাড়ীর আরোহী দুজনের মধ্যে যাঁর গায়ে দামী শাল ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নাম ঠিকানা ?

—আমার নাম শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র। বাড়ী কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

'কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা'—শুনেই ক্ষিতীশ বুঝলে যে ইনি কমলার গ্রামের লোক। হরেনের বাপের নাম যে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, তা সে কোনও দিন শোনে নি। আর এটাও সে জানতে পারলে না যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কমলারই বাপ—হরনাথ মৈত্র, দুজনে এখনি ট্রেণ থেকে নেমে হরেনের বাসার দিকে চলেছেন।

ইতিমধ্যে লোক-জনে ধরাধরি করে' ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। গাড়ী দুখানি নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হল।

ট্রেণ ছাড়তে তিন মিনিট মাত্র বাকী থাকতে ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছল। হরেন গাড়ী থেকে গলা বের করে' ফটকের পানে চেয়ে ছিল। ক্ষিতীশ এসে পৌঁছতেই বল্লে—তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম এসে বুঝি জুটতে পারলে না !

ক্ষিতীশ বল্লে—ওঃ, হাঙ্গাম কি কম হে ! রাস্তায় আস্তে আস্তে এক ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে হয়ে গেল কলিসন !

—কি রকম ?

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে' ক্ষিতীশ বল্লে—আরও মজা

শোন, সে-গাড়ীতে যে লোকটি ছিল, সে আবার তোমাদের দেশের লোক! বাড়ী বল্লে—কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

কমলা বলে উঠ্‌ল—কালীগ্রামের লোক? কে ক্ষিতীশদা?

ক্ষিতীশ বল্লে—তার নামটি কি ভাল, ভুলে যাচ্চি! হ্যাঁ—যতীন্দ্রনাথ বোধ হয়। হ্যাঁ ঠিক—যতীন্দ্রনাথ মিত্র।

কমলা ভেবে চিন্তে বল্লে—যতীন্দ্রনাথ মিত্র কে আবার আমাদের গ্রামে? কে, মনে ত পড়চে না। কত লোক আছে গ্রামে, সবাইকে কি চিনি!

হরেনও যতীন্দ্রনাথ মিত্র বলে' কাউকে মনে করতে পারলে না।

গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ বাতি দুলিয়ে দিলে। বম্বে মেল চলতে আরম্ভ করলে।

ওদিকে যোগেন মিত্র, কমলার বাপকে সঙ্গে করে' বউবাজারের হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে', উভয়ে মেসের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরেন বাবুর ঘর কোথা?

একজন দেখিয়ে দিলে—ঐ তেতলায় পূব-দক্ষিণ কোণের ঘর।

দুজনে তেতলায় উঠে, পূব-দক্ষিণ কোণের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, হরেনের নিজস্ব খানসামা গোপবংশাবতংস ক্ষুদিরাম ঘোষ মেঝের উপর বসে' থেলো হুঁকো হাতে করে' তার মাথায় কলকেটিতে একমনে ফুঁ দিচ্চে।

ক্ষুদিরাম নিজের জমিদার বাবুকে এই রকমে হঠাৎ সশরীরে

উপস্থিত দেখে ধড়মড় করে' দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। হুঁকোটা সরিয়ে ফেলে জমিদার বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

যোগেন বাবু বল্লেন—কি রে ক্ষুদিরাম, কেমন আছিস তোরা ?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে, ভালই আছি হুঁজুর।

—হরেন বাবু কোথা ?

—আজ্ঞে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেলেন।

—কবে ?

—আজ্ঞে আজই—এই আধ ঘণ্টা হল। বোম্বাই মেলে রওনা হলেন।

—ফিরবেন কবে ?

—আজ্ঞে, সোমবারে ফিরবেন বলে গেছেন।

—একলাই গেছেন ? না সঙ্গে কেউ গেছে ?

—আজ্ঞে, সঙ্গে ত আর কাউকে দেখলাম না, কেবল—

ক্ষুদিরাম কথাটা বলতে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল। সম্প্রতি তার গ্রামের একজন গোয়ালা কলকাতায় এসেছিল তার কাছে ক্ষুদিরাম একটা গুজবের কথা শুনেছিল।

যোগেন মিত্র চীৎকার করে' উঠ্‌লেন—কেবল কি ? ঠিক করে' সব কথা বল্ হারামজাদা, নইলে জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—আজ্ঞে তিনি যাবার আগে দরজায় একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর শব্দ শুনেই বাবু বল্লেন চল্! আমি তাঁর ব্যাগ ছাতা ছড়ি নিয়ে

পিছু পিছু গেলাম। বাবু গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লেন—কমলা তুমি একলা যে। গাড়ীর মধ্যে চেয়ে দেখি, এই দাদাঠাকুরের মেয়ে, কমলা দিদিমণি গাড়ীতে বসে' রয়েছেন। দিদিমণি কি করে' এখানে এলেন তাও কিছু বুঝতে পারলাম না। বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌বারও সময় পেলাম না,—বাবু গাড়ীতে উঠ্‌তেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

হরনাথ মৈত্র "হা জগদীশ্বর!" বলে', ধপ্ করে' অন্য একখানি চেয়ারের উপর বসে' পড়লেন।

যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কমলা দিদিমণিকে আর কোনও দিন কলকাতায় দেখেছিলি?

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে বল্লে—আজ্ঞে না হুঁজুর। আর কোনো দিন দেখি নি! এই প্রথম। এ-কথা হুঁজুরের পা ছুঁয়ে বলতে পারি।—বলেই ক্ষুদিরাম যোগেন বাবুর পায়ে হাত দিলে।

—কোন গাড়ীতে গেছে বল্লি? বোম্বাই মেলে?

—হুঁজুর।

একটা দীর্ঘ "হুঁ" বলে' যোগেন মিত্রও একখানা চেয়ারে বসলেন। ব্যাগ থেকে টাইম টেবেল বের করে', চশমাটি চোখে দিয়ে বল্লেন—দেওয়াল থেকে ঐ আলোটা নামা দেখি।

ক্ষুদিরাম আলো নামিয়ে ধরলো। যোগেন বাবু টাইম টেবেল পরীক্ষা করে' বল্লেন—বম্বে মেল, হাওড়া ছাড়ে, ৯টা ৩৫ মিনিট, ক্যালকাটা টাইম এখন ৯টা ৪৫—দশ মিনিট হল গাড়ী ছেড়ে গেছে।

১২

বম্বে-মেল স্থান ও কালের অসীমতাকে যেন উপহাস কোরে ফুৎকার দিতে দিতে ছুটে চলেছিল, যেন ময়দানবের খোকা একটা হাউই-এ আগুন লাগিয়ে ময়দানের বুকের উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বাহিরের মাঠের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ঝোপঝাড় গাছপালা অন্ধকারের জমাট ডেলার মতন দেখাচ্ছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীর ভিতরকার আলো জান্‌লার ফুকোরে ফুকোরে উঁকি মেরে তাদের দেখ্‌ছে। এই দুর্দ্দান্ত বেগের বুকে বোসে কমলা হরেন আর ক্ষিতীশ, তিন জনেই অনুভব কর্‌ছিল, এ যেন নিয়তির গতি; তাদের টেনে নিয়ে যে কোথায় ছুটেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

কমলা তার স্বামীর কাছে চলেছে, যে-স্বামী তাকে একদিন না দেখে থাক্‌তে পারে না—তার কাছে এতদিনের অদর্শনের পর ফিরে চলেছে! এতে কমলার মনে আনন্দ না ভয় বেশী হচ্ছিল, তা সে স্পষ্ট টাহর কর্‌তে পার্‌ছিল না। কমলা ভাব্‌ছিল, এতদিন সে বাড়ী ছাড়া, তিনি যদি এ-কথা টের পেয়ে থাকেন তা হলে কি তিনি তার কথা বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন? তার ছেলে হয়নি বোলে শাশুড়ী ত তাঁর ছেলের আবার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েই ছিলেন, কেবল ছেলের মন হয়নি বোলেই তিনি সঙ্কল্প পূর্ণ কর্‌তে পেরে ওঠেন নি; এখন যদি এই ছল ধোরে তিনি ছেলের বিরক্ত মনের সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

New Artistic Press, Calcutta

কোরে থাকেন, তা হলে সে গিয়ে দেখ্‌বে তার জায়গা আর-একটি মেয়ে এসে দখল কোরে বোসে আছে, শুধু বাড়ীতে নয়, স্বামীর হৃদয়েও,—সেখানে তার আর কোথাও ঠাঁই নেই। এতদিন হয়ত তার স্বামী তাকে কত খুঁজেছেন, কিন্তু সে ত তাঁকে এতদিন কিছুই খবর ছায়নি; বাপের বাড়ীতেও ত ছায়নি। সুতরাং সে যদি শ্বশুরবাড়ীতে ও স্বামীর হৃদয়ে বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী তার শাশুড়ী আর স্বামী, না সে নিজে, কমলা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। যদিই তার স্বামী এর মধ্যে বাস্তবিকই বিয়ে কোরে থাকেন, তবে তার গতি কি হবে? যদিই এখন স্বামী তার সমস্ত কথা শুনে বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ কর্‌তে চান, তাহলেই কি সে সতীনের সঙ্গে ঘর কর্‌তে পার্‌বে? যে বাড়ীতে ও হৃদয়ে সে একেশ্বরী ছিল, সেখানে আর-একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোকের সঙ্গে নিজের অধিকার নিয়ে নিত্য টানাটানি কর্‌তে হবে? আর যদি স্বামী আর শাশুড়ী গ্রহণ না-ই করেন, তবে ত সব ফুরিয়ে গেল, তখন সে দাঁড়াবে কোথায়? বাপের বাড়ীতে বাপ মা তাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন না হয়ত; কিন্তু একমাস পরে স্বামীর বাড়ী ও মন থেকে বিতাড়িত হয়ে সে কোন্ মুখে গিয়ে বাপের বাড়াতে দাঁড়াবে? তাঁরাই কি তাকে আর বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বেন, না আগের মমতা তাঁদের কাছ থেকে সে পাবে? স্বামী যাকে অবিশ্বাস কোরে তাড়িয়ে দিয়েছে, একমাস যে কোথায় ছিল কি করেছে কেউ জানে না, তাকে বাড়ীতে নিলে তার বাবার সমাজে মাথা তুল্‌বার জো

থাক্‌বে না। তার বাবার উঁচু মাথা হেঁট কোরে সে পাবে শুধু ত একটু আশ্রয়—যা হবে ঘৃণায় বিষদিগ্ধ, উঠ্‌তে বস্‌তে গঞ্জনায় কণ্টকময়! কিন্তু সে আশ্রয়ও যদি সে না পায় তবে? ক্ষিতীশ তাকে আশ্রয় দিয়েছে অসহায় বিপন্ন দেখে; তার বাড়ীতে চিরজীবন থাক্‌বে সে কিসের অধিকারে? ক্ষিতীশই বা তাকে চিরকাল পুষ্‌বে কেন? কিন্তু তখনই কমলার মনে পড়্‌ল ক্ষিতীশের কথা—'যাক্, আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল!' কমলাকে নিজের কাছে রাখ্‌বার যে আগ্রহ ক্ষিতীশের এই অসাবধানে-বলা সাবধানে-ঢাকা কথার মধ্যে ধরা পড়েছে তাতে তার এই আশ্রয়ও আর নিরাপদ নয়; ক্ষিতীশের মনের ভাব ত শুধু এই একটি কথাতেই ধরা পড়েনি, তা যে ধরা পড়ে তার চোখের প্রত্যেক দৃষ্টিতে। কমলাকে দেখ্‌তে পেলেই তার মনের খুসী চোখের কোণে উঁকি মেরে তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল কোরে তোলে, সে ঢাকতে চাইলেও ধরা পড়ে; সে কতবার কত ছল কোরে কমলার কাছে এসে একটা কথা বোলে যাবার চেষ্টা করে, দূর থেকে কেমন একটা মুগ্ধ কাতর দৃষ্টি ফেলে সে তার দিকে চেয়ে থাকে। এই কথা মনে হতেই কমলা চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে গাড়ীর ওপারের বেঞ্চিতে কোণে ঠেস্ দিয়ে পা ছড়িয়ে ক্ষিতীশ বোসে আছে, কিন্তু তার দৃষ্টিটি আরতি-প্রদীপের শিখার স্বর্ণরশ্মির মতন এসে পড়েছে তারই মুখে। কমলা মনে মনে শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে তার দৃষ্টি দেখে এল হরেনকে। হরেন কাম্‌রার মাঝখানের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে, তার দৃষ্টি গাড়ীর

আলো-ঢাকা সবুজ ঘেরাটোপের আশে-পাশে ফানুষ-ঢাকা আলোর ধারে পতঙ্গের মতন চঞ্চল হয়ে ছট্‌ফট করছে। কমলা ভাব্‌লে—'হরেন-দাদা ত বড়লোক, সে আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বে না?' এই কথা মনে হতেই চরম দুঃখের হতাশায় কমলার হাসি পেল—'বাপের বাড়ীতে শ্বশুর-বাড়ীতে যার ঠাঁই হল না, তাকে ঠাঁই দেবে হরেন-দা! হরেন-দার বাবা ত তার বাপের গাঁয়েরই লোক; তিনি তাঁর ছেলেকে কেন আমার মতন স্বামীর তাড়ানো বাপ-মার খেদানো মেয়েকে আশ্রয় দিতে দেবেন?' কমলা আর ভাব্‌তে পার্‌ল না, সে গাড়ীর জান্‌লার ধারে বোসে বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল—সেখানে কী বিরাট জমাট অগাধ অন্ধকার! তার নিজের ভবিষ্যৎটাকেও মনে হল অমনি অগাধ অন্ধকারের জঠরে হারিয়ে যাওয়া। যা হবে তাই দেখ্‌বার প্রতীক্ষাতেই কমলা স্তব্ধ হয়ে বোসে রইল—সে ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে আর ভাব্‌তে পার্‌ছিল না।

ক্ষিতীশ গাড়ীর এপারের জান্‌লার ধারে বেঞ্চিতে কোণে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বোসে একদৃষ্টে কমলাকেই দেখ্‌ছিল। গাড়ী দেশ ও কালকে ফুৎকারে টিট্‌কারী দিতে দিতে ছুটে যত এগিয়ে চল্‌ছিল ক্ষিতীশের ততই মনে হচ্ছিল কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে তার স্বামীর নিকটতর হয়ে চলেছে আর তার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ছে! তাই এই গোণা মুহূর্ত্ত কটির যতক্ষণ কমলা তার চোখের সাম্‌নে আছে সেইটুকুতেই সে নিজের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ কোরে নিতে চাচ্ছিল, মন আগ্রহ দৈন্য ঠেলে তার

চোখের কপাট খুলে রেখেছিল, চোখের পল্লব পড়্তে দিচ্ছিল না। কমলা বিবাহিতা, সে তাকে বোন বোলে স্বীকার করেছে, তবু তার মনে হচ্ছিল একে সর্ব্বদা কাছে রাখ্তে পেলে তার জীবন ধন্য হত। সে বাপ-মার একমাত্র সন্তান; কমলা যদি তার বোন হয়েই তাদের বাড়ীতে থাকৃত তা হলেও ত সে সুখী হত, এমন কথাও সে মনকে দিয়ে বলাচ্ছিল; মোটের ওপর তার মনের ইচ্ছাটা কেমন ঘোলা হয়ে উঠেছিল, কিছুই স্পষ্ট ছিল না। কমলাকে সে হয়ত এজন্মে আর কখনো দেখ্তে পাবে না; স্বামীর আদরে কমলার মনে এই কটা দিনের স্মৃতি একটা দুঃস্বপ্নের মতন আব্ছায়া আতঙ্কে জড়িত হয়ে থাকৃবে; কচিৎ কখনো যখন এই দুর্দ্দিনের কথা কমলার মনে পড়্বে তখনই তারই মাঝে মাঝে তার কথা কমলার মনে হবে, আর হয়ত একটু কৃতজ্ঞতা তার মনের কোণে মাথা তুল্তে-না-তুল্তে স্বামীর সোহাগে সব ডুবে যাবে। কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে তার লাভ হল এই জীবন-জোড়া মর্ম্মজ্বালা! হঠাৎ কমলা তার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে একটু হাস্লে দেখে ক্ষিতীশের চৈতন্য হল, সেও একবার হর্মেনের দিকে চট কোরে দেখে নিয়ে জান্লার বাইরে অন্ধকারের কালীর মধ্যে আপনার ব্যথিত দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে; আর তার যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়্ল, তা গাড়ীচলার হুহুশ্বাসের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

গাড়ীর মাঝের বেঞ্চিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো বেঞ্চির পিঠের ঠেসানের ওপর তুলে দিয়ে উর্দ্ধদৃষ্টিতে আলোর সবুজ

বনাতের ঘেরাটোপটার দিকে তাকিয়ে হরেন ভাব্‌ছিল অন্য-রকম ভাবনা।—'কালীগ্রামের যতীন মিত্তির কে? বোধ হয় ক্ষিতীশের ভুল হয়েছে—কালীগ্রামে মিত্তিরবংশ ত তারা ছাড়া আর কেউ নেই—ক্ষিতীশ যাঁকে যতীন মিত্তির বল্‌ছে তিনি হয়ত তার বাবা, মৈত্রমশায়কে সঙ্গে কোরে কল্‌কাতায় কমলার খোঁজ কর্‌তে এসেছেন। যদি তার বাবাই এসে থাকেন, তা হলে মেসে তার খোঁজ কর্‌তে যাবেনই; এই অকস্মাৎ কলেজ কাম্‌াই কোরে কল্‌কাতা ছেড়ে আসাতে তিনি রাগ কর্‌বেন নিশ্চয়। ফিরে গিয়ে কমলার বিপদের কথা বল্‌লেই তাঁর রাগ পোড়ে যাবে। আমি কমলার সঙ্গে এক মোটারে এসেছি ক্ষুদিরাম তা দেখেছে। বাবা যদি শোনেন যে একলা কমলার সঙ্গে আমি কল্‌কাতা ছেড়ে চলেছি তা হলে তিনি কি ভাব্‌বেন? কাউকে কিছু না বোলে চোলে আসা ভালো হয়নি দেখ্‌ছি। শেষকালে কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে আমাকে না বিপদে পড়্‌তে হয়।' ভাব্‌তে ভাব্‌তে হরেনের মনে ভয় ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে এখনই গাড়ী থেকে নেমে ফিরে যেতে পারলে বাঁচ্‌ত; কিন্তু গাড়ী ত একছুটে একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে তবে দম নেবে। হরেনের রাগ হতে লাগ্‌ল কমলার ওপর—কমলি চূড়ামণি যোগে গঙ্গায় ডুব দিতে এসেছিল! এখন গোলযোগে সে ডুবেছে। তাকে তুল্‌তে গিয়ে যে হরেনও ডুব্‌তে চলেছে! দুজন যুবাপুরুষে সুন্দরী যুবতীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে—এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতের ওপর আজকালকার

লোকের কি তেমন বিশ্বাস হবে? কমলির স্বামী যদি তাকে না নেয়? তা হলে তাকে নিয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হবে? তারপর? হরেন তার বাবাকে আর কমলার বাবাকে কেমন কোরে বিশ্বাস করাবে যে কমলা যে হারিয়ে গেছে তা সে আগে জান্‌ত না আর জেনেছেও অনেক পরে! ভবিষ্যৎ সমস্যা অত্যন্ত জটিল বোধ হতে লাগ্‌ল বোলেই হরেন মনে কর্‌তে চেষ্টা করল ক্ষিতীশ যাকে দেখেছে সে যতীন মিত্তিরই, তার বাবা নন।

গাড়ীর কাম্‌রার তিনটি প্রাণী নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল, গাড়ী একদম চুপচাপ। হঠাৎ হরেন শরীর ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বোসে বোলে উঠ্‌ল—আচ্ছা ক্ষিতীশ, তোমার ট্যাক্সি যাদের গাড়ী ভেঙে দিয়েছিল, তাদের একজনের নাম বল্‌লে যতীন মিত্তির।—যোগেন মিত্তির নয়?

ক্ষিতীশ আর কমলা দুজনেই জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে ছিল; হরেনেব হঠাৎ-কথায় দুজনেই চম্‌কে উঠে ঘুরে বস্‌ল। ক্ষিতীশ বল্‌লে—তাও হতে পারে, আমার ত ঠিক মনে নেই—ঐ তাড়াতাড়ির সময় একবার মাত্র শোনা।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—তাঁর চেহারা কেমন বল্‌তে পারো?

ক্ষিতীশ বল্‌লে—বেশ ঢ্যাঙা শক্ত চেহারা, রং ফর্শা খুব বড় একজোড়া আধপাকা গোঁপ আর খাঁড়ার মতন নাক, চোখ দুটো ভারী চটা রকমের—দেখ্‌লেই তাকে একরোখা লোক বলেই মনে হয়।

হরেনের মুখ শুকিয়ে গেল। কমলা বোলে উঠ্‌ল—উনি ত

তাহলে মিত্তির-জেঠা, হরেন-দাদার বাবা! তাঁর সঙ্গে কে ছিল ক্ষিতীশ-দা?

আজ কমলার মুখে অসঙ্কোচ ক্ষিতীশ-দা সম্বোধন শুনে ক্ষিতীশ একটু হেসে বল্‌লে—তাঁকে ত আমি চিনিনে ভাই, তাঁর নামও শুনিনি। তবে তাঁর চেহারা বর্ণনা কর্‌তে পারি, তা থেকে তোমরা চিন্‌তে পারো যদি।—লোকটি বেঁটে, মোটাসোটা গোলগাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দাড়ি গোঁপ কামানো, মাথায় টিকি আছে, আর নাকের ওপর একটা আঁচিল…

কমলা বোলে উঠ্‌ল—ইনি আমার বাবা। হয়ত পোষ্টমাষ্টারের কাছে শুনেছেন যে হরেন-দার রেজেষ্টারী চিঠি গিয়ে ফিরে এসেছে তাই মিত্তির-জেঠাকে সঙ্গে কোরে হরেন-দার কাছে আমার খোঁজ কর্‌তে এসেছেন।

কমলার এই অনুমান হরেনের কাছেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য বোলে বোধ হল বোলেই তার মুখ আরো শুকিয়ে গেল। হরেন আর কোনো কথাই বল্‌বার খুঁজে পেলে না। ক্ষিতীশও যে কি বল্‌বে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। হরেন আর ক্ষিতীশ দুজনকেই চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে কমলাই আবার কথা বল্‌ল—তা হলে এই পরের ষ্টেশনে নেমে আমাদের ফিরে গেলে হয় না?

কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে মেসে নিজের ঘরটিতে উপস্থিত থাক্‌বার জন্যে হরেনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; তার বাবা আর মৈত্রমশায় গিয়ে যেন দেখ্‌তে পান সে কল্‌কাতাতেই আছে, কমলাকে নিয়ে সে পশ্চিমে যায়নি। তাই কমলার কথা শুনে উৎসুক হয়ে হরেন

ক্ষিতীশের মুখের দিকে তাকালো। ক্ষিতীশ বল্‌লে—পরের ষ্টেশন ত সেই বর্দ্ধমান? আজ রাত্রে ফের্‌বার ত আর গাড়ী নেই। কাল সকালের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যতক্ষণে পৌঁছব প্রায় ততক্ষণে আমরা লক্ষ্ণৌ পৌঁছে যাব। যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব, ততদিন ওঁরা কল্‌কাতাতেই থাক্‌বেন নিশ্চয়!

ক্ষিতীশ যখন বল্‌ছিল—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব—তখন তার কথার সুরে আর চোখের দৃষ্টিতে এমন একটি বিষাদ ফুটে উঠেছিল যে তা কমলার কাছে ধরা পোড়ে গেল; কমলা নিজের স্বামীর উল্লেখে আর ক্ষিতীশের কথার ভঙ্গীতে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল; ক্ষিতীশ দেখ্‌লে কমলার মুখ কমলবর্ণ হয়ে উঠেছে, তার ওপর সবুজ রঙের ঘেরাটোপে ছাঁকা সবুজ আলো পোড়ে তাকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে—যেন অরুণ-বেলার ফুটনোন্মুখ কমলের গায়ে সবুজ পাতা থেকে অরুণ-আভা প্রতিফলিত হয়েছে। কমলা মুখ ফিরিয়ে বোসে ভাব্‌ছিল ক্ষিতীশের প্রত্যেকটি কথার নিগূঢ় অর্থ—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব। ক্ষিতীশের কথা যা বল্‌লে তার মন যে তা বল্‌তে চায়নি তা তার কথার বিষণ্ণ সুরই কমলাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে—ফিরিয়ে দিতে সে যাচ্ছে বটে, কিন্তু অনিচ্ছায়, এবং ফির্‌বে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যে নয় তা নিশ্চিত, এবং ফিরিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা যে ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হতে না-ও

পারে এ সন্দেহও তার মনে বিলক্ষণ আছে! কমলা লজ্জায় ভয়ে যেন ম্যোরে যাচ্ছিল। সে অন্ধকারের মধ্যে তার লজ্জিত দৃষ্টি ডুবিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বোসে রইল।

হরেন বেচারা একরকম মরীয়া হযে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্ষিতীশ তাই দেখে বল্‌লে—রাত হয়েছে, শুয়ে পড়া যাক্‌। কমলা তুমিও শুয়ে পড়ো।

কমলা মুখ না ফিরিয়েই বল্‌লে—আপনারা শোন্‌। আমার এখনো ঘুম পায়নি।

১৩

কমলার স্বামী চাকরী করত লক্ষ্ণৌ সহরে। ক্ষিতীশ হরেন আর কমলা লক্ষ্ণৌয়ে নেমে একখানা গাড়ী কোরে গণেশী মহল্লায় সতীশের বাসার সন্ধানে গেল। গাড়োয়ান যখন গণেশী মহল্লায় পোঁছে বল্‌লে—বাবু, এহি তো গণেশী মহল্লা আ চুকা।—তখন ক্ষিতীশ বল্‌লে—কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়, সতীশবাবুর বাসাটা কোথায়।

হরেন সমস্ত পথটা আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে গম্ভীর হয়েই এসেছে; এখনো তার কোনো চেষ্টা বা উদ্যম দেখা গেল না; তার কেবলই মনে হচ্ছিল সতীশ যদি কমলাকে না নেয়, তা হলে সে কমলাকে নিয়ে ফিরে কালীগ্রামে কেমন কোরে যাবে? এর চেয়ে ঢের ভালো হত যদি সে কমলাকে নিয়ে আপ্তে বাড়ী যেত।

তারা সতীশের বাসার যত কাছাকাছি হচ্ছিল ততই তার মুখ শুকিয়ে উঠছিল। কমলারও মুখ একেবারে বোঁটাছেঁড়া পদ্মফুলের মতন দারুণ উদ্বেগে আম্‌লে উঠে ম্লান হয়ে পড়েছিল। কতকাল পরে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে এই সম্ভাবনা যত ঘনিষ্ঠ হয়ে আস্‌ছিল, ততই লজ্জা আনন্দ আতঙ্ক অনিশ্চয়তা তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছিল, তার বুক ঢিপঢিপ কর্‌ছিল।

পথ দিয়ে একজন বাঙালীকে যেতে দেখে ক্ষিতীশ গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মশায়, সতীশ রায়ের বাসা কোন্‌টা বল্‌তে পারেন?

সেই লোকটি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোন্ সতীশ রায়? যিনি পোষ্টাপিসে কাজ করেন, না যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন? এখানে দুই সতীশ রায় আছেন।

কমলার বুকের মধ্যে একটা তুমুল তোলপাড় বেধে গেল। ক্ষিতীশ বল্‌লে—যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন তিনি।

লোকটি বল্‌লে—ঐ যে ল্যাম্পপোষ্টটা দেখা যাচ্ছে, তার সাম্‌নে ঐ যে রক-বারকরা বাড়ী—ঐটে সতীশ বাবুর বাড়ী। তা তাঁরা ত এখানে কেউ নেই। তাঁর স্ত্রীর খুব ব্যামো বোলে ছুটি নিয়ে কয়েকদিন হল তিনি দেশে গেছেন।

ক্ষিতীশ খানিকটা হতাশ খানিকটা আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাড়ীতে কেউ নেই?

উত্তর হল—না, বাড়ীতে তালা বন্ধ। সতীশ বাবুর মা-ঠাক্‌রুণ কেবল এখানে ছিলেন, তিনিও সতীশ বাবুর সঙ্গে গেছেন।

ক্ষিতীশ গাড়ীর মধ্যে মুখ টেনে নিয়ে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্‌ল—তাইত ! এখন কি করা যায় ?

ক্ষিতীশ হতাশভাবে কথাটা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তার অন্তরের আনন্দ তার চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল। যাক, কমলা এখনো দু-চার দিন তার কাছেই থাক্‌বে তাহলে।

আসন্ন প্রত্যাখ্যানের ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কমলারও অনেকটা স্বস্তি বোধ হল ; কিন্তু স্বামীর কাছে ফির্‌তে যত দেরী হবে তত তার কৈফিয়তের বোঝা ভারী হয়ে উঠ্‌বে আর তার স্বামীর বিশ্বাস করা তত কঠিন হয়ে পড়্‌বে ভেবে কমলা উতলা হয়ে উঠ্‌ল। ভদ্রলোকটি যে বল্‌লেন—সতীশ বাবু তাঁর স্ত্রীর ব্যামো বোলে বাড়ী গেছেন—এ-কথার মানে কি ? সে যে অসুখ হয়ে ক্ষিতীশের বাড়ীতে পোড়ে ছিল, এ-খবর কি তিনি পেয়েছেন ? কেমন কোরে পাবেনই বা ? সে যে হারিয়ে গেছে এক মাসেরও ওপর হল, এ-খবর তিনি নিশ্চয় পেয়েছেন। এতদিন সে তাঁকে চিঠি দেয়নি, এতদিন পরের বাড়ীতে সে আছে, সে বাড়ীতে আশ্রয়দাতার কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই, এ-সমস্তই তাকে এমন ভয় পাইয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রীর অসুখ বোলে এই যে দেশে যাওয়া, এর মানে কি নতুন স্ত্রীকে বরণ কোরে ঘরে আনা ; সে-বাড়ীতে তার প্রবেশের দ্বার একেবারে রুদ্ধ কোরে দেওয়া ? কী সর্ব্বনাশ ! সে তাহলে দাঁড়াবে কোথায় ? ক্ষিতীশ যখন হতাশভাবে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্‌ল—তাইত এখন কি করা যায় ? তখন কমলা ভয়ার্ত্ত কাতর দৃষ্টিতে

ক্ষিতীশের দিকে ফিরে তাকালো, তার চোখে জল ছলছল কর্‌ছিল।

হরেনও দুর্ভাবনায় একেবারে ডুবে গিয়েছিল। সতীশের হাতে কমলাকে সঁপে দিয়ে বোঝা নামিয়ে সে হাল্কা হয়ে ফির্‌তে পার্‌লে তার ভাবনা অনেকখানি কোমে যেত; এখন আবার কমলাকে নিয়ে কল্‌কাতায় ফির্‌তে তার ভয় কর্‌ছিল—সেখানে তার ও কমলার বাবা বিচার কর্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন। হরেনকে তার বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—হরেন তাঁকে কিংবা মৈত্র মশায়কে খবর দ্যায়নি কেন, অথবা কমলার বাপের বাড়ী নিকটে থাক্‌তেও তাকে সেখানে নিয়ে না গিয়ে পশ্চিমে অতদূরে নিয়ে গিয়েছিল কোন্ আক্কেলে,—তখন সে কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না বোলেই হরেনের ভয় আরো ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল এবং তাতে কোরে চঞ্চল হরেন একেবারে গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে উঠেছিল। আর হরেনের এই অটল গাম্ভীর্য্য কমলাকেও ভয় পাইয়ে তুল্‌ছিল।

হরেন ও কমলাকে নির্ব্বাক নিরুত্তর দেখে ক্ষিতীশ বল্‌লে—তা হলে ত কল্‌কাতাতেই ফিরে যেতে হয় এখন।

হরেন দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লে—তা ছাড়া আর উপায় কি?

ক্ষিতীশের হুকুমে আবার ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে ফিরে গেল এবং পরের ট্রেনে তারা তিনজনে আবার কল্‌কাতা ফিরে চল্‌ল। টেন যখন চল্‌ছিল তখন কমলা আর হরেন দুজনেই ভাব্‌ছিল ট্রেনে কলিশন হয়ে তারা গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যদি যায় ত বেশ হয়—কমলাকে তা হলে অপরাধীর মতন স্বামীর কাছে

সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, স্বামীর প্রত্যাখ্যানের অথবা সতীনের সঙ্গে ঘর করার দুঃখও সহ্য করতে হয় না; আর হরেনও তার দারুণ কড়া বাবার বিচারের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

কেবল ক্ষিতীশের মনের মধ্যে যে আনন্দ স্ফূর্ত্তিলাভ করছিল তার আভা তার মুখে পোড়ে মুখ উজ্জ্বল কোরে তুলেছিল।

ক্ষিতীশেরা বিকেলবেলা কল্‌কাতায় এসে পৌঁছলো। ক্ষিতীশ একটা ট্যাক্‌সি ভাড়া কোরে কমলাকে তাতে তুলে হরেনকে ডাক্‌লে—চড়ো।

হরেন শুষ্কমুখে বল্‌লে—তোমাদের সঙ্গে আমি আর এখন যাব না; এখম আমি বাসায় যাই। বাবা আর মৈত্র মশায় কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে সন্ধ্যের পর তোমাদের সঙ্গে দ্যাখা কর্‌ব।

কমলা উৎসুক হয়ে ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে—যত শিগ্‌গির পারো তুমি এসো হরেন-দা।

হরেন বল্‌লে—আচ্ছা।

ক্ষিতীশ ট্যাক্‌সিতে উঠে বস্‌ল এবং ট্যাক্‌সি ছুটে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। হরেন অপর একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে তাতে আপনার বিছানা ব্যাগ তুলে নিজের মেসের উদ্দেশে রওনা হল।

হরেন মেসে পৌঁছে চীৎকার কোরে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, ওরে ক্ষুদে!

মেসের ঝি এসে বল্‌লে—ক্ষুদিরাম ত এখানে নেই বাবু।

হরেন রেগে বোলে উঠ্‌ল—সে নবাবপুত্তুর কোথায় হাওয়া খেতে গেলেন ?

ঝি বল্‌লে—আপনার দেশ থেকে কত্তাবাবু এসে ক্ষুদিরামকে নিয়ে গেছেন।

হরেনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত সন্ কোরে উঠে বন্ কোরে ঘুরপাক্ খেয়ে হৃদয়ে হুড়মুড় কোরে নেমে এল। সে জোর কোরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে নিজেই ট্যাক্‌সি থেকে ব্যাগ বিছানা নামিয়ে ফেল্‌লে এবং ট্যাক্‌সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তুহাতে ব্যাগ আর বিছানার মোট ঝুলিয়ে টক্‌টক্ কোরে ওপরে উঠে গেল। ওপরে নিজের ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে হরেন আরো আশ্চর্য্য হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল—তার ঘরে তার জিনিসপত্রের চিহ্নও নেই, আছে সেখানে আস্তানা গেড়ে বোসে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত কে—সে লুঙ্গি প্পোরে আরামে বোসে শট্‌কার নলে তামাক ফুঁক্‌ছে। হরেন দরজার সাম্‌নে হাতের বোঝা নামিয়ে ফেলে ফিরে দাঁড়াতেই তাদের মেসের পুরোনো মেম্বর গৌরাঙ্গ তার কাছেই আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলে। হরেনকে ফির্‌তে দেখেই গৌরাঙ্গ বোলে উঠ্‌ল—আরে হরেন যে ? কখন এলে ?

হরেন গৌরাঙ্গের হাসির বদলে হাস্‌তে না পেরে শুক্‌নো মুখেই বল্‌লে—ব্যাপার কি গৌরাঙ্গ ? আমার ঘর বেদখল—অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ?

গৌরাঙ্গ বল্‌লে—তুমি কিচ্ছু জানো না নাকি ? যেদিন তুমি পশ্চিম গেলে, সেইদিনই তোমার বাবা আর এক কে মৈত্র মশায়

এসেছিলেন। তোমার বাবা আমাদের ডেকে বল্‌লেন—'হরেন আর এখানে থাক্‌বে না; আমি হরেনের জিনিসপত্তর সব নিয়ে যাচ্ছি—এই সেসনের সীট-রেণ্ট আর অন্য কিছু যদি মেসের পাওনা থাকে চুকিয়ে দিয়ে যাব।' তিনি তোমার সীট-রেণ্ট দিয়ে গেছেন; কিন্তু আমরা পরদিনই বিলাসবাবুর শালাকে মেম্বর পেয়ে গেলাম; তাই তোমার সীট-রেণ্টের টাকা কাল মনি-অর্ডার কোরে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হরেন প্রাণপণ বলে খুব সপ্রতিভ থাক্‌বার চেষ্টা কোরে সহজভাবে বল্‌লে—ও! আচ্ছা, এখন ভাই আমার মোট দুটো তোমার ঘরে রেখে দাও, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব!

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—এখনই এসেই কোথায় চল্‌লে!

হরেন সিঁড়ি নামতে নামতে বল্‌লে—একবার বাবার খোঁজ নিয়ে আসি, তিনি আছেন, না দেশে ফিরে গেছেন।

গৌরাঙ্গ উপর থেকেই হেঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—রাত্রে এখানে খাবে ত? ঝিকে চাল নিতে বল্‌ব?

হরেন চেঁচিয়ে বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল—না, চাল নেবার দর্‌কার নেই।

হরেন একলা নিরিবিলিতে নিজের অবস্থাটা ভেবে তলিয়ে বুঝে নেবার জন্যে চেনা লোকের সংস্রব ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। হরেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে চল্‌তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হল। সে বাগানে ঢুকে এক টেরে একটা বেঞ্চিতে বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তার বাবার হঠাৎ

তাকে কোনো খবর না দিয়ে তার বাসা তুলে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না; কেবল আব্‌ছায়া এই বুঝ্‌ছিল যে কমলা হারানোর সঙ্গে এর একটা কিছু যোগ আছে। কিন্তু কমলা হারানোর সঙ্গে যে তার কি অপরাধ ঘটেছে তা সে মাথা আলোড়ন কোরেও আবিষ্কার করতে পার্‌ছিল না। হয়ত তাঁদের খবর না দিয়ে কমলাকে নিয়ে পশ্চিমে যাওয়াতে তিনি রেগেছেন। যাক, সে ভাবনা ভেবে কোনো ফল নেই যখন, তখন ভাবা মিছে; এখন ভেবে দেখা উচিত তার কি করা উচিত। বাবার সঙ্গে দেখা কোরে অভিযোগ শুনে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার মধ্যে একটা যে হীনতা আছে তার অপমান, বিনা দোষে অবিচারে বাবার দণ্ডদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান এবং বাবার সাম্‌নে আসামী হয়ে বিচারপ্রার্থী হবার ভয়—তিনে মিশে আবেগময় হরেনের মন আচ্ছন্ন কোরে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। সে পকেট থেকে মনিব্যাগ টেনে বার কোরে দেখ্‌লে তার সঙ্গে এখনো একান্ন টাকা সাড়ে তেরো আনা সঙ্গতি আছে; হাতে একটা হীরের আংটি আর সোনার ঘড়ীচেনও পুঁজি আছে! এতে তার কিছুদিন নির্ভাবনায় চল্‌বে। তবে সে কেন হীনতা স্বীকার করতে যাবে?

এই সঙ্কল্প স্থির কোরেই হরেন বাগান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল এবং ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আর বেঙ্গলী কাগজের আফিসে গিয়ে

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

New Artistic Press, Calcutta.

দুটো বিজ্ঞাপন দিয়ে এল—Situations Wanted কলমে। যা হোক একটা কিছু চাকরী নিয়ে সে নিজের পায়ে ভর কোরে দাঁড়াবে।

হরেন যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে মনকে হাল্কা কোরে নিজের অঙ্গীকার-মতো ক্ষিতীশের বাড়ীতে কমলাকে তার বাবার খবর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কালীগ্রামে কাঁণা শশী খুব-খুসী মুখ থেকে পাকা লাউ-বিচির মতন বড় বড় দাঁত বার কোরে মৈত্র মশায়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিল—মৈত্র মশায়, আজ রাত্তিরে আমার বাড়ীতে আপনি দয়া কোরে আহার কর্‌বেন; মানসিক ছিল—মা-কালীর কাছে একটা পাঁটা বলি দিয়েছি—এই উপলক্ষ্যে মার মহাপ্রসাদ বন্ধুবান্ধব মিলে একটু একটু মুখে দেওয়া।

১৪

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আপিস থেকে বেরিয়ে বরাবর ধর্ম্মতলার পথ ধোরে হরেন ক্ষিতীশের বাসার দিকে চলেছে, হঠাৎ মনে হলো চাকরির জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে। একবার সে ফিরে দাঁড়ালো, ভাব্‌লে, যাই ওটা বন্ধ কোরে দিয়ে আসি। আবার ভাব্‌লে, দূর হোক্‌-গে ছাই, বিজ্ঞাপনটা না হয় বেরিয়েই গেল, চাকরি নেওয়া না-নেওয়া তো তারই হাতে।

হরেনদের কলেজে একটি সমিতি ছিল; তার উদ্দেশ্য হচ্ছে

দেশ থেকে চাকরি-গ্রহণের প্রবৃত্তি সমূলে নির্ম্মূল করা, হরেন এই সমিতির একজন প্রধান পাণ্ডা। চাকরিতেই যে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে, এই মর্ম্মে সে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই বক্তৃতা করত এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল যে প্রাণ গেলেও সে কখনো চাকরি গ্রহণ করবে না। শুধু নিজে স্বাক্ষর নয়, পথে-ঘাটে যেখানে যাকে পেত, তর্ক কোরে বুঝিয়ে, খোঁসামোদ কোরে ধোরে, তাতেও না হলে ধমক-ধামকে, শেষে ঘুসি-বাগিয়ে এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিত। এমনি কোরে প্রায় হাজারটা স্বাক্ষর সে সংগ্রহ করেছিল। অল্পদিনেই এতখানি কাজ সমিতির কোনো মেম্বর করতে পারেনি—সেই জন্যে সমিতির সবাই তাকে বাহবা দিত। এবং হরেনের নিজের মনেও এই নিয়ে খুব-একটা গর্ব্ব ছিল যে, তার দ্বারাই সমিতির এবং দেশের অনেকখানি কাজ অগ্রসর হয়েছে। মনের উদ্বেগে বাবার উপর অভিমান কোরে, সাত-তাড়াতাড়ি চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে আসাতে হরেনের বুকের ভিতরে একটা দারুণ অনুশোচনার কাঁটা খচ্‌খচ্ করতে লাগ্‌ল। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে, চাঁদনির সামনে ফুটপাথে কেবলই এদিক-ওদিক কোরে পায়চারি করতে লাগ্‌ল। প্রতিজ্ঞাপত্রের দু-একখানা কাগজ তখনো তার বুক-পকেটে ছিল; হরেনের মনে হতে লাগ্‌ল, সেগুলো যেন তাকে ভ্রূকুটি করছে! সে রেগে পকেট থেকে সেগুলো বার কোরে কুচিকুচি কোরে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে। তখন তার

চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল সেই সব লোকের মুখ-ভঙ্গী, যারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, স্বাক্ষর করা সহজ; কিন্তু কার্য্যকালে—। হরেন বাকি কথাটা আর মনে আনবার ধৈর্য্য রাখতে পারলে না। তার মনে হতে লাগ্‌ল, ঐ কার্য্যকালটাই তার সমস্ত আত্ম-অভিমানকে অপমানে কালো কোরে তুলেছে। প্রথম-প্রয়োজনের কাছেই ত সে হার মেনে গেল! বুদ্ধি, বিচার দিয়ে এখন না-হয় ত্রুটি সংশোধন করা চলে; কিন্তু প্রথম-অভাবেই ভিতরকার প্রেরণা ত তাকে দাস্যবৃত্তির পথেই ঠেলে নিয়ে ফেল্লে! ধিক্ তাকে।

হাজার বিজ্ঞাপন দিক্, চাকরি সে কিছুতেই করবে না, এ যদিও স্থির, তবু যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের পাপের মতো চাকরির ইচ্ছার পঙ্কটা তো তাকে গায়ে মাখতে হল! এতে নিজের উপরে তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ্‌ল;—কেন ঐ প্রতিজ্ঞা-পত্রের কথাটা তার যথাসময়ে মনে হল না? কিন্তু মনে হবে কি কোরে? হরেনের মনটি এম্‌নিভাবে গড়া যে যখন যেটা তার মনের ভিতর ঢুকে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সেইটি ছাড়া আর-কোনো দিকে তার খেয়াল থাকে না—খেয়াল সে রাখ্‌তেই পারে না—মন এম্‌নি একবগ্‌গা হয়ে ছোটে। হরেন মনে-মনে খুব জোরের সঙ্গে বল্লে, বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বেশ করেছে, লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি এলেও সে তা গ্রহণ করবে না! কিন্তু করবে কি? একান্ন টাকা সাড়ে-তেরো-আনা সঙ্গতি নিয়ে ত

চিরজীবন চলে না? তা চলে কি, না চলে, কে জানে? হরেনের সেজন্যে কোনো দুর্ভাবনা দেখা গেল না। এবং দুর্ভাবনা যে আগেও হয়েছিল, তা ঠিক নয়। বাপকে এবং শ্বশুরের টাকাকে অগ্রাহ্য কোরে সে নিজে কি করতে পারে, এরই উত্তেজনায় চাকরি করতে গিয়েছিল। যাক্, চুলোয় যাক্ চাক্‌রি! সে নিজের আত্মমর্য্যাদা সবল কোরে নিয়ে জোরে-জোরে পা ফেলে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল।

১৫

সাম্‌নে শ্যামবাজারের একখানা ট্রাম এসে থাম্‌ল। হরেনের পা তার অজ্ঞাতে তাকে সেই ট্রামের কাছে ঠেলে নিয়ে গেল। গাড়ির ঠাণ্ডা হাতলটায় আপনা-হতে হাত পড়তেই তার চমক ভাঙলো। ট্রাম লোকে লোকারণ্য। হরেনের মন তখন নির্জ্জনতা খুঁজছিল। সে ট্রাম ছেড়ে আবার ফুট্‌পাথে উঠ্‌ল। একবার মনে হল, অনেকটা দূর, ট্রামেই যাই। আবার ভাবলে, নাঃ, হেঁটেই চলি। অন্যমনস্কে পা-দুয়েক গেছে এমন সময় তড়াক্-কোরে ট্রাম থেকে লাফিয়ে কে-একজন একেবারে হরেনের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—পিছন থেকে তার জামার ঘাড়টা টেনে চীৎকার কোরে বল্লে—"পালাও কোথায়?"

হঠাৎ বাধা পড়াতে হরেন থম্‌কে গেল। পিছন থেকে জামার ঘাড়ের কাছটা এমন কক্করে কোরে ধরা যে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই পেলে না, কে তাকে ধরেছে। তার মনে

হল, নিশ্চয় কোনো গুণ্ডা। তখন দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে দু-একটা রাহাজানির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে বার হচ্ছে এবং তাই নিয়ে চারদিকে আন্দোলন চলেছে। হরেনের মনে হল, এ তারই একটা পুনরাবৃত্তি। গুণ্ডার সঙ্গে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি তখন তার ছিল না; পুরুষমানুষ হয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার কোরে পাড়া মাথায় করাটাও তার লজ্জাজনক মনে হতে লাগ্‌ল। সে পকেট থেকে একান্ন টাকা সাঁড়ে-তেরো-আনার ব্যাগটা বার কোরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—"এই নে! যা!" হরেনের গলার কাপড় যে ব্যক্তি ধরেছিল, সে কাঁপতে-কাঁপতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, সজোরে সেটা ছুঁড়ে হরেনের মুখের উপর মারলে।

আঘাতের ধাঁধাটা চোখ থেকে কেটে গেলে হরেন দেখ্‌লে, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অরুণ—রাগে ফুলছে! অরুণকে দেখেই সে আনন্দে এতটা অভিভূত হয়ে পড়ল যে অরুণের সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তির জন্যে কোনো বিস্ময় তার মনে আমোলই পেলে না; ব্যাগটা যে অরুণই ছুঁড়ে মেরেছে, এমন কোনো সংশয়ও তার মনে এল না। সে সাদরে অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লে—"আরে অরুণ! তুই কখন্ কলকাতায় এলি? কার সঙ্গে এলি? আমায় খবর দিস্ নি কেন? চল্, চল্!"—এই বোলে তার হাত ধোরে টেনে নিয়ে চল্ল। মনিব্যাগটা পথেই পড়ে রইল।

অরুণ যতটা রাগ নিয়ে হরেনকে আক্রমণ করেছিল, হরেনের এই স্নেহের ব্যবহারে তার সবটাই যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সে যতগুলো কড়া-কথা শোনাবে বোলে এতদিন ধোরে ঠিক কো'রে রেখেছিল, তার একটাও বল্‌তে পারলে না। চিরকালই অরুণ হরেনকে দাদার মতন দেখে এসেছে, ছেলে-বেলা থেকে তার কাছে কত আদর-আব্দার করেছে, তার কাছ থেকে কত স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছে;—এই সমস্ত এতকালের সঞ্চিত স্নেহপ্রীতির আবেগ তার সেই ক্ষণিক উত্তেজনার মূলে প্রবল নাড়া দিতে লাগ্‌ল। প্রথম যখন ট্রাম থেকে সে দেখে, হরেন গাড়িতে উঠতে-উঠতে উঠ্‌ল না, তখন তার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে হরেন তাকে দেখেই পালাচ্চে, তাই সে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে তার গলা ধরেছিল; তার পর যখন হরেন তার দিকে ব্যাগটা ফেলে দিলে, তখন তার মনে হল, হরেন তাদের যা ক্ষতি করেছে, তারই মূল্যস্বরূপ যেন এই টাকা ধোরে দিচ্ছে; তাই অপমানে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই টাকার ব্যাগ সে হরেনের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু এখন তার মুখের দিকে চেয়ে অরুণের মনে হতে লাগ্‌ল, এ সেই হরেন-দাদা,—সেই চিরদিনের হরেন-দা! হরেনের বাহুস্পর্শে সমস্ত উত্তাপের জ্বালা যেন তার জুড়িয়ে গেল। মনে হল, গ্রামের সেই কুৎসা-গ্লানি স্কুলের সমপাঠীর বিদ্রূপ, মা-বাপের মর্ম্মান্তিক শোক—সে সমস্তই মিথ্যা, মায়া! হরেন-দাদা তাদের চিরদিনের মিত্র;—শত্রু নয়।

অরুণ খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—"দিদি কোথায়, জানো হরেন-দাদা?"

হরেন সোৎসাহে বল্লে—"আরে, সেইখানেই ত তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

অরুণের মনটা আবার খট্-কোরে বেঁকে দাঁড়ালো। তবে তো মিথ্যা নয়—গ্রামের সমস্ত কুৎসা তবে ত সত্যি! সে চল্তে-চল্তে থেমে পড়ল। হরেন বল্লে—"থাম্লি কেনরে?"

অরুণ উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ গলার মধ্যে চেপে ঘাড়-বাঁকিয়ে বল্লে—"তা হলে সত্যিই তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ!"

হরেন বিস্মিত হয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ?"

অরুণের মনে হল, যেন হরেন বল্তে চায়—এ আর সর্ব্বনাশ কি! এতবড় গুরুতর ব্যাপারকে হরেন এমন তাচ্ছিল্য করছে ভেবে অরুণের বিষম রাগ হইতে লাগ্ল। সে সজোরে হরেনের হাত ছাড়িয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ নয়ত কি? পরের বিবাহিত মেয়েকে"—অরুণ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

হরেন আরো বিস্মিত হয়ে বল্লে—"পরের বিবাহিত মেয়েকে কি করেছি?"

"কি করেছ আবার জিগ্গেস্ করছ?"

অরুণের ঐ কথার সুরে কেমন-একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন হরেনের বুকের মধ্যে ধীরে-ধীরে জমা হতে লাগ্ল। সে বল্লে—"অরুণ, তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি না।

অরুণ হরেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সে মুখ সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক; তার মধ্যে প্রতারণা, অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র নেই। সেই মুখের পানে চেয়ে অরুণের কেমন ধাঁধা লাগ্তে লাগ্ল।

হরেন অধীর হয়ে বল্লে—"চুপ কোরে রৈলি কেন? বল্, কি বল্‌ছিলি!"

অরুণ কি-করে কথাটা বল্‌বে ঠিক করতে না পেরে খানিকটা আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগ্‌ল। শেষে একনিশ্বাসে বোলে ফেল্লে—"তুমি আমার দিদিকে লুকিয়ে রেখেছ?"

হরেন খুব-একটা বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—"তোমার দিদিকে আমি লুকিয়ে রেখেছি? লুকিয়ে রাখতে যাব কেন?"

অরুণের মনে হল যেন হরেন কথার প্যাঁচ দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিচ্চে। সে বলছে, লুকিয়ে রাখবো কেন? অর্থাৎ···কি বোলে জিজ্ঞাসা করলে হরেন আর ফাঁকির পথ পাবে না, অরুণ অনেকক্ষণ ভেবেও তা ঠিক করতে পারলে না। সে খানিকটা থেমে বল্লে—"তবে দিদি কোথায়?"

হরেন বল্লে—"তোমার দিদি আছেন ক্ষিতীশ বাবুর বাসায়।"

অরুণ অবাক হয়ে বল্লে—"ক্ষিতীশ বাবু! সে কে?"

"যিনি তোমার দিদির প্রাণ রক্ষা করেছেন।"

"প্রাণ রক্ষা?"

"হ্যাঁ, তোমার দিদি ভিড়ের চাপে ভির্মি গিয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন, ক্ষিতীশ বাবু তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচান্।"

অরুণ আশঙ্কা-রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"দিদি ভালো আছে ত?"

"হ্যাঁ।"

অরুণের চোখের সাম্‌নে থেকে যেন একটা প্রকাণ্ড কুয়াশা কেটে গেল। তার সেই বালক-হৃদয়ের মধ্যে তখন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কোনো প্রশ্ন আর রইল না। সে দিদিকে দেখ্‌বার জন্যে অধীর হয়ে হরেনের হাত টানতে-টানতে বোলে উঠ্‌ল—"চল, শীগ্‌গির কোরে চল—দিদিকে দেখ্‌ব!"

হরেন অন্যমনস্কে বল্লে—"চল।" তার মনের মধ্যে সেই অজ্ঞাত আতঙ্কটা যেন ক্রমেই আরো জমাট বাঁধছিল। সে তারই দিকে চেয়ে-চেয়ে ভিতরে-ভিতরে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল!

অরুণ যেতে-যেতে বল্লে—"হরেন-দাদা, তোমাদের ঐ শশী মুখুজ্জেটা কি পাজি।"

হরেন কথাটার উপর কোনো মনোযোগ না দিয়েই বল্লে—"কেন, সে আবার কি করলে?"

"সেই তো তোমার নামে আর দিদির নামে যত কুৎসা রটিয়েছে।"

হঠাৎ কেমনতর-একটা ধাক্কা হরেনের বুকে এসে লাগ্‌ল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে বল্লে—"কি কুৎসা?"

"সেই তো রটিয়েছে যে তুমিই দিদিকে সরিয়ে রেখেছ। আগে থাকতে তোমাদের সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ছিল।"

হরেনের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠ্‌ল। সে বোলে উঠ্‌ল—"পাজি নচ্ছার! তাকে আমি দেখে নেব!"

হরেন খুবই রেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেই রাগের ঝাঁজ

বেশীক্ষণ রইল না। তার সেই ভিতরকার অজ্ঞাত-আতঙ্কের অন্ধকারে সেটা যেন কেমন তলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

কমলা এতদিন বাড়ী-ছাড়া—নিরুদ্দেশ; এ নিয়ে একটা বিষম গোল হবে, এ দুর্ভাবনা তার ছিল; আবার সময়-সময় আশা হতো হয়ত কোনো গোল নাও হতে পারে; কিন্তু সে যে ষড়্‌-কোরে কমলাকে কুলের বার করেছে, এত বড় অপবাদ রাষ্ট্র হবে—এ-কথা সে ভাবতেও পারে নি। কোথায় ছিল কমলা, আর কোথায় ছিল সে—কতদিন তাদের ছাড়াছাড়ি! এর মধ্যে পরামর্শ হলই বা কখন্ এবং কেমন কোরেই বা হল? এর কোনো সাক্ষীসাবুদ না পেয়েই লোকে যে কেমন কোরে এই কুৎসা রটালে সে তা বুঝতে পারছিল না। সে ভাবছিল, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? সে জিজ্ঞাসা করলে—

"অরুণ, এ-কথা কি কেউ বিশ্বাস করেছে?"

"করেছে বৈ কি!"

"কে করেছে?"

"সকলেই!"

"বাবা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"মা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা-মা?"

"তাঁরাও।"

"তুমি ?"

"করেছিলুম বৈ কি। না, না, প্রথমটা করিনি! সবাই যখন বলতে লাগ্‌ল ঠাট্টা করতে লাগ্‌ল, তখন বিশ্বাস না কোরে করি কি হরেন-দা ?"

হরেন আর কিছু বল্লে না, কেবল তার বুকের গভীরতা থেকে একটা দীর্ঘ হুঁ-শব্দ বার হল মাত্র। তার সমস্ত মন একটা প্রকাণ্ড অভিমানে ভরে উঠ্‌ল! বাপ-মা থেকে আরম্ভ কোরে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাকে এমন হীন ভাবতে পারলে মনে কোরে সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠ্‌ল। সে কী করেছে—তার চরিত্রে, ব্যবহারে লোকে এমন কী পেয়েছে, যাতে এতবড়-একটা কলঙ্ক তার বুকের উপর দাগ্‌তে কেউ একটু ইতস্তত করলে না? তাকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলে না! একটা পরীক্ষা করলে না যে এ সত্য, কি মিথ্যা। একেবারে বিচারের রায় বেরিয়ে গেল!—তার মনে হল, জগতে কেউ তার মরমী বন্ধু, মুখ-চাইবার আপনার জন নেই। বাপ-মা পর্য্যন্ত না। এই জন্যেই সে মায়ের কাছ থেকে এতদিন ধোরে কোনো চিঠি পাচ্ছে না, এই জন্যেই, বাবা এসে রেগে বাসা উঠিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য কোরে চলে গেছেন!

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা কি বলছেন ?"

অরুণ বল্লে—"শুনচি তিনি আপনাকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন।"

হরেন আপনার মনে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—"বেশ! বেশ!"

অরুণ পথে যেতে-যেতে বকর্‌-বকর্‌ কোরে কত কথাই বলছিল, তার কোনোটাই হরেনের কানে যাচ্ছিল না, কোনো কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করছিল না—সে যেন পৃথিবীর মাটিতে পা না দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

নিজের কথা ভাবতে-ভাবতে হরেনের মনে এল কমলার কথা। হরেন বল্লে—"অরুণ, কমলাকে সবাই কি বল্‌ছে?"

অরুণ বল্লে—"দিদির নিন্দেয় তো দেশে কান পাতবার যো নেই—তাই তো আমি গ্রাম ছেড়ে, বাবা-মাকে না বোলে পালিয়ে এসেছি—তোমাকে ধরবার জন্যে।"

"তোমার বাবা-মা কি বলছেন?"

"তাঁরা বল্‌ছেন—"কম্‌লিটা যদি মরত, তা হলে আমাদের এত দুঃখু হত না!"

এই বাপ-মা! কমলা এমন কি করেছে যে তার বাপ-মাও মেয়ের মৃত্যুকে বরণীয় মনে কর্‌লে? কমলারও তবে ইহসংসারে কেউ নেই! তারও অবস্থা, তার নিজেরই মতন। হরেনের মনে হচ্ছিল, এক রশিতে দুজনকে বেঁধে পৃথিবীর লোক যেন অগাধ সমুদ্রে তাদের ফেলে দিয়েছে। আহা, বেচারা কমলা! কমলার কথা ভাবতে ভাবতে হরেনের হৃদয় আকুল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে ব্যস্ত হয়ে বোলে উঠ্‌ল—"তবে কমলার কি হবে ভাই অরুণ?"

অরুণ নিজের মনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়ে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে বল্লে—"হবে আর কি! যখন কানে

ধোরে প্রমাণ কোরে দেব যে সমস্ত কুৎসা মিথ্যা, তখন লোকের মুখে জুতো পড়বে না।”

হরেনের মনে হল, এ-কথা এই বালকহৃদয়ের উৎসাহ নিয়ে সেও যদি বলতে পারত, তাহলে বেঁচে যেত! হায় প্রমাণ! এ-সংসারে প্রমাণের অপেক্ষা কে রাখে? এত বড় কলঙ্ক যারা তাদের কপালে এঁকে দিতে পেরেছে, তারা সেই কলঙ্ক দেবার সময় কি প্রমাণের অপেক্ষা করেছিল? কি প্রমাণ? কোথায় প্রমাণ? প্রমাণ যদি বলবান, তবে এতখানি অবিচার তাদের উপর হলো কেমন কোরে? যে-প্রমাণ মানুষের অতদূর অবজ্ঞেয়, সেই প্রমাণের ভরসায় তারা মুক্ত হবে? বাতুলতা! কমলা সহরের রাস্তায় ভির্মি গিয়েছিল, এক ভদ্রলোক দয়া-পরবশ হয়ে তার প্রাণ রক্ষা কোরে, নিজের বাড়ীতে রেখেছে, এ-কথা কি এখন তারা মানতে চাইবে—মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আনন্দ করা যাঁদের ব্যবসা?

তবে কমলার কি হবে? হরেনের মনের ভিতর এই কথাটা একটা করুণ আর্ত্তনাদ কোরে ফিরতে লাগ্‌ল। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে কমলা বিনা-দোষে বাপ-মায়ের কাছ থেকে পরিত্যক্ত হবে। সে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“অরুণ, তোমার বাবা-মা কি কমলাকে এখন বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন?”

অরুণ চোখ-মুখ পাকিয়ে বল্লে—“কেন নেবেন না?”

কেন নেবেন না?—এ-কথার জবাব যে কতখানি জটিল,

হরেন তা কেমন-কোরে এই ছেলেমানুষকে বোঝাবে? বাপ-মায়ের হৃদয়ের উষ্ণ রক্তও যে পাষাণের মতো কঠিন শীতল হয়ে আসতে পারে, এ-কথা হরেন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করলেও, অরুণকে তা বোঝাবার চেষ্টা করলে না। সে নিজের মনের কাৎরানি শুনতে-শুনতে পথ চলতে লাগ্‌ল।

যখন প্রায় ক্ষিতীশের দরজার গোড়ায় এসেছে, তখন যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে উঠে হরেন জিজ্ঞাসা কল্লে—"অরুণ, সতীশ-বাবুর খবর কিছু জানো?"

সতীশবাবুর কথা উঠতেই অরুণের অতখানি উৎসাহ কেমন যেন দমে গেল; তার উজ্জ্বল মুখের উপর একটা কালো ছায়া এসে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে বল্লে—"জানি।"

হরেন বল্লে—"সে সব শুনেছে?"

"শুনেছে।"

"বিশ্বাস করেছে?"

"বোধ হয়।"

"বোধ হয় কেন?"

"না, বোধ হয় নয়; ঠিকই বিশ্বাস করেছে।"

"কি কোরে জানলে, বিশ্বাস করেছে?"

"শুনলুম তার নাকি আবার বিয়ে হচ্ছে।"

"বেশ!"—বোলে হরেন যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিলে।

১৬

ক্ষিতীশের বাসায় ঢুকতেই ক্ষিতীশ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"এত দেরী হল যে হরেন বাবু? উনি আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

হরেন গম্ভীরভাবে বল্লে—"কে, কমলা?"

ক্ষিতীশ অরুণের মুখের দিকে একটা সন্দেহের সঙ্গে চেয়ে বল্লে—"হ্যাঁ!"

এই আগন্তুকটি কে? তাই জানবার জন্যে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হরেনের মুখের দিকে চাইলে। পূর্ব্বের মতো গম্ভীরভাবেই হরেন বল্লে—"ও আমাদের অরুণ!" যেন তাইতেই তার সব পরিচয় দেওয়া হয়ে গেল! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে হরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল—আরো-কিছু বিশদভাবে শুনতে; কিন্তু হরেনের মুখ থেকে উত্তরের কোনো আভাস পাওয়া গেল না। মৈত্র মশায়ের খবর কমলাকে দেবার জন্যে ক্ষিতীশ ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই অপরিচিতের সাম্‌নে কমলা-সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল না।

ওদিকে কমলা হরেনের জন্যে সেই বিকেল থেকে ঘর-আর-বার করছিল। যতই দেরী হচ্ছিল, ততই তার উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটা ভয় বেড়ে উঠছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসাটা যেন শুভ লক্ষণ নয়—এই রকম

'একটা শঙ্কা কেবলই তাকে উৎপীড়িত করছিল। এই যে একটা অশুভ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো--তার কঠোর মূর্ত্তি নিয়ে, এ যে কি কোরে তবে ছাড়বে, তা কে বল্‌তে পারে! এতদিন কমলার মনে কোনো দুর্ভাবনা শিকড় গেড়ে বস্‌তে পারে নি। আজ না হয় কাল, বাপ-মায়ের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে দেখা হবেই—এই আশার উত্তেজনায় তার দিন কাটছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে ফিরে আসার নৈরাশ্য তাকে এই প্রথম ধাক্কা দিলে। সেই থেকে কেবলই তার মনে হচ্ছে যেন কোথায় কি-একটা ভয়ানক-কিছু তালগোল পাকিয়ে উঠছে। বাড়িতে ফিরে যাওয়া প্রথমে যত সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ বুঝি নয়;--যেন সে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছে, তা থেকে ঠেসে বেরিয়ে আসা শক্ত! কি হবে? কে জানে?—এই রকম একটা অনিশ্চিতের আশঙ্কা ক্রমাগতই তার বুকের উপর আঘাত দিচ্ছিল। সেই জন্য একটা-কিছু ভালো নিশ্চিত খবর পাবার জন্যে সে ছট্‌ফট্‌ কোরে বেড়াচ্ছিল। হরেনের যতই দেরি হচ্ছিল, ততই সে আরো উতলা হয়ে উঠছিল। ঘর থেকে কেবলই ছুটে-ছুটে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল। এতক্ষণে নীচে হরেনের গলা পেয়ে সে দুর্‌দুর্‌ কোরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বৈঠকখানা-ঘরের পাশটিতে চুপ-কোরে দাঁড়ালো। তারপর যেই অরুণের নাম শুনলে অমনি ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কমলাকে হঠাৎ দেখে ক্ষিতীশ চম্‌কে উঠল। বালক হলেও অপরিচিতের সাম্‌নে এমন কোরে আসাটা ঠিক হলোনা। সে অরুণের হাত ধোরে তাকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় অরুণ চেঁচিয়ে উঠল—"দিদি!" কমলার মনের আবেগ এতটা বেড়ে উঠেছিল যে সে কোনো কথাই কইতে পারলে না—সে এগিয়ে এসে শুধু অরুণের হাতখানি ধরলে। তারপর ভাই-বোনে দুজনে মুখোমুখি খানিক চেয়ে রইল। কমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে-ধীরে বল্লে—"ভাই অরুণ, এসেছিস্?" অরুণ শুধু বল্লে—"দিদি!"

কমলা চমক-ভেঙে বল্লে—"অরুণ, ক্ষিতীশদাদাকে প্রণাম কর।" অরুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের মুখের পানে খানিক-ক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর প্রণাম করলে। অরুণের মনে হল, এই ত তার দিদি, সেই দিদিই আছে—কৈ কিছুই ত বদল হয়নি! তবে? হরেন চুপ-কোরে চেয়ে ভাই-বোনের এই মিলনের আনন্দ দেখছিল। আর তার মনে হচ্ছিল, এই কঠোর সংসার-মরুভূমে এমনিতর স্নেহের নির্ঝর যদি তার একটি থাকত!

কমলা বাপ-মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা কোরে অরুণের হাত ধোরে তাকে উপরে নিয়ে গেল। যেতে-যেতে অরুণের মনে হতে লাগ্‌ল, এই ঘর, এই বাড়ি, এই ক্ষিতীশদাদা, হরেন-দাদা, এদের আশপাশ সমস্ত কেমন-একটি শুভ্র শুচিতায় ভরা। এর সমস্তখানি যেন হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে মাখানো; কোথাও

যেন কোনো মলিনতা, নিষ্ঠুরতা নেই। লোকের টিট্‌কারি আর নিন্দা শুনে-শুনে তার মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে দিদি যেখানে আছে, সে স্থানটা বুঝি নরক। আজ এই পবিত্রতার মধ্যে দিদিকে অধিষ্ঠিত দেখে তার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে হৃদয় নির্ম্মল আনন্দে ভরে উঠল।

বাড়িতে নতুন অতিথি, রাত্রিও হয়েছে, তার উপর কমলার আজ আনন্দের দিন! ক্ষিতীশ বড়-গোছের একটা ভোজের আয়োজন করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল—হায়, কমলা এইবার চলে যাবে! নিশ্চয়! তিন দিন পূজোর পর বিজয়ার দিন পূজোবাড়িটা যেমন খাঁ-খাঁ করে, তার মনের ভিতরে তেমনিতর একটা শূন্যতার আভাষ জেগে উঠছিল। এই বাড়ি-ঘর, এই আসবাব-পত্র, নিজের হাতে টাঙানো ছবি, নিজের হাতে সাজানো লাইব্রেরী —এ সবই যেন কেমন মিছে মনে হতে লাগ্‌ল। কমলা চলে যাচ্ছে যেন জগতের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে! যদি সে পারত তাহলে রূপকথার দৈত্যের মতো এই কমলাকে সকলকার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে চলে যেত—সে কোন্ অজ্ঞানা নিরালা গুহার মধ্যে!

হরেন একা চুপটি কোরে সেই ঘরে বসেছিল। তার আহত হৃদয় ক্রমেই অভিমানে ভরে উঠ্‌ছিল। এ অভিমান শুধু বাপ-মায়ের উপর নয়—এ অভিমান জগৎ, সংসার, সমাজ, সবার উপর! যতই এ অভিমান বাড়্‌ছিল, ততই একটা

বিতৃষ্ণা তার সমস্ত মনকে তেতো কোরে তুলছিল। সে মনে-মনে বলছিল, কিছু চাইনা, কাউকে চাইনা! কিন্তু কমলা? তার মনে হতে লাগ্‌ল, এই কমলাকে যেন নিয়তি তার বুকের উপরে আছড়ে এনে ফেলেছে! এই কমলা, ছেলে-বেলাকার সেই কমলা! দিন-রাত যার সঙ্গে খেলাধুলো, মান-অভিমান, হাসি-কান্নায় কেটেছে। কেমন কোরে ক'দিনের জন্যে এ-কমলা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কে জানে? আবার কমলা ফিরে এসেছে। কোথা থেকে, কি কোরে এল, কিছুই জানিনা—শুধু দেখ্‌ছি, সে এসেছে! সকল-কার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সে আমার কাছে ফিরে এসেছে। কে যেন সংসার থেকে তাকে ছিঁড়ে এনে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। তার আর কে আছে? কেউ নেই। বাপ-মা নয়, স্বামী নয়;—কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। সে অনাথ, সে আশ্রয়-ভিখারী!—সে আমার কমলা! হরেন যতই ভাবতে লাগ্‌ল ততই আশ্চর্য্য হতে লাগ্‌ল যে কেমন কোরে নিজেদের অজ্ঞাতে তারা দুজনে একই দণ্ডে বাঁধা প'ড়ে পাশাপাশি এসে দাঁড়াল! এ যেন প্রলয়ের পর কেবলমাত্র দুটি প্রণয়ীর চারিদিক-জলে-ঘেরা এক টুক্‌রো ডাঙায় মুখোমুখি চেয়ে থাকা! হরেন বোসে-বোসে স্বপ্ন দেখতে লাগ্‌ল।

১৭

অরুণকে পেয়ে কমলার মনে হতে লাগ্‌ল যেন তার সাম্‌নের দুর্দ্দিন-দুর্ভাবনাগুলোর অস্তিত্ব আর নেই ; যেন সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। অরুণ নিজের মনের স্ফূর্ত্তি দিয়ে কমলার সমস্ত আশঙ্কা মুছে দিয়েছিল ; এবং যেটা আসল ভয়ের কথা, সে-ভয়টার আগাগোড়াই যখন মিথ্যা, তখন সে-সম্বন্ধে অরুণের মনে কোনো খোঁচ্‌ না থাকাতে, সেকথা দিদির কাছে সে আর উত্থাপনই করেনি। অরুণের হাব-ভাবে কথাবার্ত্তায় কমলা এমন একটা আশ্বাসলাভ করলে যে তারও মনে যেন আর কোনো আশঙ্কা রইল না। সে মনের উল্লাসে গঙ্গাস্নান করতে আসার পর থেকে যত ঘটনা ঘটেছিল, একে-একে অরুণকে বল্‌তে লাগ্‌ল। এর অধিকাংশই ক্ষিতীশের কথা। তার স্নেহ; তার যত্ন, তার আদর যে কমলার মনের এতখানিটা অধিকার কোরে বোসে আছে, অরুণকে বল্‌তে গিয়ে কমলা তা এই প্রথম টের পেলে। কমলা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্ষিতীশের কথা বল্‌ছিল যে শুন্‌তে-শুনতে অরুণের মনও ক্ষিতীশের প্রতি একটা প্রগাঢ় প্রীতিতে ভরে উঠতে লাগ্‌ল। কমলা বল্লে—"এতদিন পরের বাড়িতে আছি, কিন্তু একদিনের তরেও মনে হয়নি যে এ পরের বাড়ি! সত্যি বলচি ভাই অরুণ, এই ক্ষিতীশদাদা নিশ্চয় কেউ আমাদের আপনার লোক!"

অরুণ কি বল্‌বে খুঁজে না পেয়ে বোলে উঠল—"ক্ষিতীশ-বাবু সত্যিই বড় ভালো লোক!"

কমলা বল্লে—"শুধু ভালো লোক নয়—ভালো লোক তো ঢের আছে, কিন্তু আপনার লোক পৃথিবীতে ক'টা পাওয়া যায় ভাই ?"

অরুণ বল্লে—"তা তো বটেই! দেখ না, নিজের কাজকর্ম্ম ফেলে তোমার জন্যে কি না করেছেন! তোমায় ঘাড়ে কোরে বিদেশ পর্য্যন্ত ঘুরে এলেন! কিন্তু ভাই-দিদি, হরেনদাদাও তোমার জন্যে অনেক করেছেন বল্‌তে হবে!"

কমলা বল্লে—"আরে, হরেনদাদা ছিল কোথায়! তাকে তো ক্ষিতীশ বাবুই খুঁজেপেতে আনলেন!"

অরুণের মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগ্‌ল, সে বল্লে—"তা বোলে হরেন-দাও তো কম করেনি!"

কমলা বল্লে—"হরেন-দাদা তো কর্ব্বেই! সে হল আমাদের গ্রামের লোক—আপনার লোক বল্লেই চলে;—সে করবে না তো করবে কে? কিন্তু অজানা অচেনা এই ক্ষিতীশ বাবু—"

অরুণ বল্লে—"তা বটে। ক্ষিতীশ বাবুকে দেখে অবধি আমারও তাই মনে হয়—"

কমলা বল্লে—"সেই জন্যেই ত ওঁকে আমি ক্ষিতীশ-দা বোলে ডাকি।"

অরুণ বল্লে—"আমিও এখন থেকে ক্ষিতীশ-দাদা বলব!"

কমলার খট্‌-কোরে মনে হল,—এখন থেকে বটে, কিন্তু আর কতদিন? একটা কি দুটো দিন বৈ তো নয়। তারপর এই ক্ষিতীশদাদা থাকবেন কোথায়, আর, আমি থাকব

কোথায়? ক্ষিতীশদাদা নানা কাজে হয়তো আমায় ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারব না। সেই বিদেশে—যেখানে আপনার লোক বেশী নেই—সেই খোট্টার দেশে প্রতি-অবসরে আমার মনে পড়বে এই ক্ষিতীশদাদাকে! এঁকে দেখবার জন্যে কত মন-কেমন করবে কিন্তু দেখতে পাব না;—হয় ত ইহজন্মেই আর পাব না! কেবল থেকে-থেকে মনে পড়বে এই ক'টা দিনের স্মৃতি; শুধু মনের সম্বল হয়ে থাকবে এই ক'টা দিনের ক্ষিতীশ-দাদা! ভাবতে-ভাবতে কমলার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠ্‌ল। চোখে জল এল।

খাবার জায়গা হয়েছে বোলে অরুণকে ডাকতে এসে ক্ষিতীশ দেখলে, কমলার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল—মুক্তোর মতো টল্‌টল্ করছে। কমলা এ-বাড়ীতে এসে অবধি কখনো কেঁদেছে কি-না ক্ষিতীশ জানেনা, সে কোনো দিন তার চোখের জল দেখেনি। এই সে প্রথম দেখলে। কান্না দেখলে মানুষের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু কি-জানি-কেন ক্ষিতীশের মনে হতে লাগ্‌ল—কি সুন্দর ঐ দুফোঁটা জল। যদি ঐ দু-চোখের দুটি ফোঁটা সে পায়, সাত-রাজার ধন মাণিকের মতো সোনার কৌটায় লুকিয়ে রাখে—চিরদিন, চিরজীবন! তার মনে হল, জীবনের সমস্ত ক্ষতি যেন এই দুফোঁটা চোখের জল পূরণ কোরে দিতে পারে!

চোখের জল ঝরে পড়ে গেল. তবু ক্ষিতীশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই চোখের পানে চেয়ে রইল। কমলা চমক-ভেঙে বোলে

উঠল—"এই যে ক্ষিতীশদাদা!" কিন্তু ক্ষিতীশের চমক ভাঙল না। তার সেই অপলক চোখের দিকে চেয়ে কমলার মনে হতে লাগ্‌ল, কে যেন তার মনের অন্ধকারটা হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখছে—এখানকার জিনিষ ওখানে ওলোট-পালোট কোরে! তাইতে সে ভিতরে-ভিতরে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল—তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

হরেন ও অরুণ খেতে বসলো। কমলা বল্লে—"ক্ষিতীশ-দাদা, তুমি বসলে না যে?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আগে ওঁদের হোক। ওঁরা হলেন অতিথি!"

কমলা বল্লে—"অতিথি-টতিথি এখানে কেউ নেই—সবই আপনার লোক! তুমি বোসো।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই কমলা!"

ক্ষিতীশ বল্লে বটে, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কিন্তু কমলা অনুভব করলে আজ নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে ক্ষিতীশদাদাকে খওয়াবার জন্যে তার সমস্ত হৃদয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বল্লে—"না ক্ষিতীশদাদা, সে হবেনা, তোমাকে বসতেই হবে।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন কমলা? আমি লক্ষ্মীছাড়াটা তো যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা-পাই খাই।"

কমলা বল্লে—"আজ তা হবে না। আজ আমি তোমায় নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে খাওয়াবো।"

ক্ষিতীশ বিস্মিত হয়ে একবার কমলার মুখের দিকে চাইলে, তারপর বল্লে—"আজ তোমার এ খেয়াল চাপলো যে ?"

কমলা একটা ব্যথাভরা সুরে বল্লে—"দাদা, আর তো তোমায় কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পাব না !" বলতে-বলতে তার গলার স্বর ধোরে আসতে লাগল। গলাটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে সে বোলে উঠল—"কাল যে আমি চলে যাচ্ছি।"

হরেন এতক্ষণ চুপ কোরে ছিল, সে গম্ভীর ভাবে বল্লে—"কোথায় ?"

কমলা বল্লে—"কালাগ্রামে !"

হরেন বল্লে—"কার সঙ্গে ?"

—"অরুণের সঙ্গে। তুমিও চলনা, হরেন-দাদা !"

হরেন সংক্ষেপে কিন্তু খুব-একটা দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লে—"না !"

কমলা বল্লে—"তোমার যদি পড়ার ক্ষতি হবে মনে কর, তাহলে না-হয় আমি একা অরুণের সঙ্গে যাই।"

হরেন বল্লে—"না !" এই না-শব্দটা এমন-একটা গভীর গম্ভীর সুরে সজোর ধাক্কার মতো বেজে উঠল যে কমলা অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পারলে না।

হরেন যে তার বাড়ী ফিরে যাওয়ায় কোনো আপত্তি করবে, কমলা কখনো তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কেন যে করছে তাও সে ঠিক বুঝতে পারলে না ; সে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"বারণ করছ কেন হরেন-দাদা ?"

হরেন কোনো উত্তর দিলে না। কমলার কেমন ভয় হতে

লাগ্‌ল। সে এবার হরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে আবদারের সুরে বল্লে—"কেন হরেন-দাদা বারণ করছ ভাই?" তার মনে হচ্ছিল, কোনো-রকমে এখনই হরেনের কাছ থেকে যাবার সম্মতি না নিতে পারলে যেন তার নিস্তার নেই!

হরেন বল্লে—"না। তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

অরুণ ও কমলা দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে হরেনের মুখের পানে চেয়ে রইল। তাদের মনে হল, হরেন যেন এমন-একটা জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে সে হুকুম করবে, তাদের মানতে হবে! কমলার একবার প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হল, কিন্তু তার উপযুক্ত বল সে মনের ভিতর থেকে সংগ্রহ কোরে উঠতে পারলে না। তখন সে আর-একবার আব্দারের সুর ধরলে, কিন্তু হরেনের মুখের দিকে চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারলে না। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে হরেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখতে লাগ্‌ল। চেয়ে চেয়ে বুঝতে পারলে হরেনের ভিতরটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের অপেক্ষায় স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কমলা ছেলেবেলা থেকে জানে, হরেনের এই অবস্থায় কিছুতেই তাকে টলানো যায় না, নড়ানো যায় না। সে ভীত হয়ে বোলে উঠলো—"তোমার আজ হলো কি হরেন-দা? তুমি অমন-কোরে রয়েছ কেন?"

হরেন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"না, কিছু হয়নি।"

ক্ষিতীশও চেয়ে দেখলে হরেন যেন আজ মোটেই হরেনের মতো নয়। কেন এমন হল, সে কিছুই ধরতে পারলে না।

কমলা হরেনের দিক থেকে হতাশ হয়ে ক্ষিতীশের দিকে ফিরলো। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি বল ক্ষিতীশ-দাদা, অরুণের সঙ্গে কালীগ্রামে যাবো না?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"হরেন যখন বারণ কচ্চে, তখন না যাওয়াই ভালো।"

কমলার কেমন ভয় হচ্ছিল যে হরেন জোর কোরে তাকে রেখে ভালো করছে না; যতই দিন যাবে, ততই তার পক্ষে অমঙ্গল। সে ক্ষিতীশের দিকে করুণ প্রার্থনার দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"কিন্তু কেন উনি বারণ করছেন, তাতো কিছু বলছেন না।"

'কারণ আবার কি! আমি বারণ করচি, যেতে পাবে না।"—বোলে হরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

এই হুঙ্কারে অভিমানের সঙ্গে কমলার একটু রাগও হল। সে বোলে উঠল—"আমি যাব। তুমি বারণ করবার কে?

হরেন কি-একটা কড়া-কথা বলতে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ তার অবসর না দিয়ে বোলে উঠল—"না কমলা, হরেন ভালো কথাই বলছে। তোমাদের বাড়ী থেকে কেউ না নিতে এলে তোমার যাওয়াটা ঠিক—সঙ্গত হবেনা। তুমি ছেলেমানুষী কোরোনা।

ক্ষিতীশের এই কথার মধ্যে কেমন-একটি স্নেহের সুর ছিল, যাতে কমলার বিরুদ্ধ মন এক-নিমেষে বশ্যতা স্বীকার কোরে ফেল্লে। তার মনে হল, ক্ষিতীশ-দা যা বলছেন, তাই তার করা উচিত। কিন্তু নিজের অবস্থার সেই অসহায়তায় তার কেমন

কান্না পেতে লাগ্‌ল। সে চাপা কান্নার সুরে বোলে উঠল—"তবে কি আমি এইখানে পড়ে থাকব না কি ?"

হরেনের বুকের মাঝে এই কান্নার সুর গিয়ে বেজে উঠল; সে বল্লে—"এখানে কেন থাকবে কমলা ? আমি তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাব।"

কমলা বল্লে—"সে তো একই কথা!—তা হলে এখানে থাকতেই বা আমার কি!"

হরেন প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বোলে উঠল—"না, না, এ হল পরের বাড়ী, এখানে তোমায় থাকতে হবে না।"

কমলা আহত হয়ে বল্লে—"ছি, ছি, অমন কথা বোলোনা হরেন-দা! ক্ষিতীশদা কি আমাদের পর!"

হরেন এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলে না। কমলার জন্যে ক্ষিতীশ যা করেছে, তাতে কমলার কথা ঠিক বটে; কিন্তু কমলা যে-সুরে সেটা বল্লে, হরেনের সে সুরটা তেমন ভালো লাগ্‌ল না। তারপর ক্ষিতীশের কথাতেই কমলার বাড়ী-যাবার জেদ ছুটে গেল—এটাও তার মনের মধ্যে কেমন খোঁচা দিতে লাগ্‌ল। সে আবার গুম্ খেয়ে গেল!

অরুণ বল্লে—"তাহ'লে আমি কাল ভোরেই বাড়ী ফিরে যাই—বাবা-মাকে খবর দিই-গে ?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"সে বেশ কথা!"

হরেন কোনো সাড়া দিলে না।

পরদিন ভোরে অরুণ যখন দিদির কাছে বিদায় নিতে গেল,

তখন কমলা বল্লে -"ভাই অরুণ, তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে লুকিয়ে—কেউ যেন না জানতে পারে।"

অরুণ বল্লে—"কি কাজ ?"

কমলা একখানা খাম-আঁটা চিঠি অরুণের হাতে দিয়ে বল্লে—"এই চিঠিখানি নিজের হাতে তোকে দিয়ে আসতে হবে।"

অরুণ বল্লে—"কাকে ?

কমলা বল্লে -"শিরোনামাটা পড়ে দেখ্ না।"

অরুণ দেখলে খামের উপর লেখা আছে—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় শ্রীচরণেষু।"

অরুণ প্রথমটা কেমন-একটু থমকে গিয়ে দিদির মুখের দিকে খানিক ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল ; শেষে মুখ নামিয়ে বল্লে—"আচ্ছা।"

১৮

দুর্গামণির পরামর্শ-মতো সতীশ মৈত্র মশায়কে একটা তার কোরে উত্তরের অপেক্ষায় রইলো ; কিন্তু মৈত্র মশায় তখন যোগেন মিত্তিরকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছেন, কাজেই সতীশের তার বিনা-উত্তরে কালিগ্রামে যেমন গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এল।

টেলিগ্রাফের তারের মতো রুলটানা নিষ্ফল গোলাপি কাগজটা হাতে কোরে সতীশকে শুক্‌নো-মুখে আস্‌তে দেখেই দুর্গামণি বুঝ্‌লেন, খবর খারাপ। তিনি আর কোনো কথা না শুধিয়ে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

New Artistic Press Calcutta

সতীশকে বল্লেন—"বাবা, আমি একবার দেশে যাবো, কোনো গতিকে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারিস্?"

সতীশ খানিক ভেবে বল্লে—"পারি। দারাগঞ্জের সতীশ বাবুর স্ত্রীর অসুখ; দেখ্‌তে তাঁর মা কল্‌কাতায় যাচ্ছেন; তুমি তাঁদের সঙ্গে গেলে জগদীশপুরে তাঁরা তোমায় নামিয়ে পাল্কি চড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি দেশে যাবে কি কর্‌তে? এখানে তো বেশ একরকম—"

দুর্গামণি সতীশের কথায় বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন—"না না, আমার না গেলে চলবে না। আর-একটি ভালো মেয়ে দেখে তোর আবার বিয়ে দিতে হবে।"

কমলার দুর্নাম রটিয়ে বেনামি চিঠিটা পাওয়া অবধি সতীশের মাথায় সন্ন্যাস-কর্‌বার একটা প্ল্যান ক্রমাগত ঘুরছিল; এবং এই প্ল্যানটা নিয়ে সে তার গুরুদেব আত্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গেও ইতিমধ্যে দু-একবার খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা কোরে একরকম সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেছে; কিন্তু আজ হঠাৎ তার মা তাকে আর-একবার সংসারের ফাঁস-কলে ফেলার চেষ্টায় আছেন জান্‌তে পেরে সতীশ বিষম ভাবিত হয়ে দুর্গামণিকে কিছু আর না বোলে-কয়েই সোজা গুরুজীর আখড়ার মুখে দুপুর রোদে একটা ভাঙা ছাতা-মাথায় বেরিয়ে পড়লো।

গোমতী নদীর ধারেই দিব্বি একটা ছোট-খাটো ইমারতে সতীশের গুরুজী গুরুমাতার সঙ্গে আখড়া বেঁধে অনেকগুলি বাঙালী উকিল আর কেরানি চেলার সেবা নিয়ে সুখে বাস করছেন।

দুপুরের রোদে তেতে-পুড়ে সতীশ সেখানে হাজির। গুরুজী তখন আহারের পর মৃগচর্ম্মের আসনে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাগবতের পুঁথিকে বালিশ কোরে নিত্য-নৈমিত্তিক ধ্যানে ছিলেন; কাজেই সতীশকে বাইরে অপেক্ষা করতে হলো।

আখড়ার বারাণ্ডার সামনেই গোমতী নদী মস্ত একটা বাঁক টেনে চলে গেছে; তার ওপারে ধূধূ মাঠ; সেই মাঠে গোটাকতক রোগা গোরু শুক্‌নো ঘাস খুঁজে খুঁজে চোরে বেড়াচ্ছে;—এই ছবিটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাংলার একটা গণ্ডগ্রামের ঘর কন্নার গোটা-কতক দিন সতীশের মনের মধ্যে আজ এমন স্পষ্ট হয়ে আনা-গোনা করতে লাগলো যে এক-সময়ে তার সন্ন্যাসের প্ল্যান গোমতীর স্রোত ধোরে কতদূরে ফেসে গেল তার ঠিকানাই নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মোটা গলায় একটা হুঙ্কার শুনে চমকে উঠে সতীশ বুঝলে, গুরুজী জেগেছেন। সে আস্তে আস্তে ছাতা আর জুতো বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

দূর থেকে গুরুজীকে ঢিপ কোরে একটা প্রণাম দিয়ে মাটির উপরে সতীশ সোজা হয়ে বস্‌লে, গুরুজী ঘুমে-ভারি দুই চোখ সতীশের দিকে ফিরিয়ে বল্লেন—"বসো খবর কি?"

সতীশ হাতদুটো খানি টা জোড় কোরে, খানিকটা মুটো কোরে উদাস সুরে বল্লে—"বড় বিপদ স্বামীজী! মা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্যে দেশে চলেছেন—মেয়ে দেখ্‌তে?"

গুরু "হুঁ!" বোলে কেবল একটা নিশ্বাস ফেলেই আসন

ছেড়ে ওঠবার উপক্রম কর্‌ছেন দেখে সতীশ একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লে—"আমার এখন কি উপায় হবে ঠাকুর?"

গুরু আকাশের দিকে দুটো ঝাঁকড়া ভুরু খুব-খানিকটা তুলে বল্লেন—"বাপু, সংসার মায়াময়! সেখানে আশঙ্কার অন্ত নেই, জ্বালাও অত্যন্ত। আমি ত বলি তুমি সোজা বেরিয়ে পড়; আর দেরি কোরো না।"

সতীশ মুখটা অত্যন্ত কাচুমাচু কোরে বল্লে—"কিন্তু আমি যে দুই সমস্যার মধ্যে পড়লুম! এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা—বিয়ে কর্‌তে; ওদিকে প্রভু বল্‌ছেন সংসার ছাড়তে!"

গুরু একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাহলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন কর। মুক্তির আশা ছেড়ে দেও।"

এই 'এই ছেড়ে দেও' কথাতেই গুরুর বাঙালে রাগ একটুখানি ঝিলিক্ দিয়ে গেল। সতীশ আরো কাচুমাচু হয়ে বল্লে—"তা কি হয়? আমি সংসার না করাই তো স্থির করেছি, কিন্তু—"

গুরুজী মস্ত একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন—"ওই কিন্তুই হলো সর্ব্বনাশের মূল! এইটুকু থাকে বোলে সাধন কোরেও তিন জন্মের পূর্ব্বে মুক্তি লাভ কর্‌তে কাউকে বড় একটা দেখলুম না।"

সতীশ অবাক্ হয়ে বল্লে—"বলেন কি! তিনজন্ম কঠোর সাধন কোরে তবে?"

"তিনটে জন্ম আন্দাজ লাগে দেখছি।"

সতীশ নিশ্বাস ফেলে বল্লে "তাহলে আমার তো কোনো

আশাই নেই দেখছি। তিনের উপরে তিন জন্মেও আমার 'কিন্তু' ঘোচে কি না সন্দেহ!"

আত্মানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"গুরুতে ভক্তি-নিষ্ঠা রেখে তাঁর আদেশ পালন কোরে চল্লে, এক জন্মেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।"

সতীশ অত্যন্ত কাতর স্বরে বল্লে—"মনে যে 'কিন্তু' আপনা আপনি ওঠে! না হলে আপনার আদেশ তো আমি যথাযথ পালন করছি।"

আত্মানন্দ শুধোলেন—"কি বিষয়ে তোমার 'কিন্তু' হচ্ছে শুনি?"

সতীশ বোলে চল্‌লো—"অনেকগুলো বিষয়ে 'কিন্তু' রয়েছে। সর্ব্বপ্রধান—হচ্ছে আমার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে, ওই বেনামি চিঠিটার উপরে। তারপর দ্বিতীয়-সংসার করা কি নয়? নির্জ্জন বাসে যাওয়া, কি বাসায় বসে সাধন করা? সবার চেয়ে শক্ত কিন্তুটা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে মাকে অনাহারে মারা, এবং কমলাকে ছেড়ে নিজেও মরা কি না?"

সতীশ রোদে তেতে-পুড়ে এসেছিল, আর গুরু ছিলেন ঠাণ্ডা ঘরখানিতে ঘুমিয়ে; কাজেই গুরু অতি কোমল স্বরে ডাকলেন—"সুধীর, বাবা, এদিকে এস তো।" গেরুয়া-আলখাল্লা-পরা নেড়া-মাথা ধীরানন্দ বাবাজী একটা লোটা-হাতে উপস্থিত হলেন। আত্মানন্দ সতীশকে দেখিয়ে বল্লেন—"বাবা সুধীর, একে একটু জল-টল খাইয়ে ঠাণ্ডা কোরে আন; আমি ততক্ষণ হাত-মুখগুলো ধুয়ে আসি।"

সতীশ গুরুজীর খড়ম-জোড়াটা এগিয়ে দিলে, তিনি খটাস্‌-খটাস্‌ কোরে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটা বাঁদর খড়মের শব্দে ঘুম ভেঙে গুরুজীর বৈকালি-ভোগের প্রসাদ-কণার লোভে ঝুপ কোরে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়লো।

সতীশ নিশ্বাস ফেলে ধীরানন্দের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"আমার ভাই, মুক্তি নেই! গুরু বল্লেন, অন্তত তিন জন্ম ফেরাফিরি করতে হবে!"

ধীরানন্দ হেসে বল্লেন—"আর আমি যদি এমন ওষুধ বাৎলে দিই যাতে এক-জন্মেই মুক্তি, তো কি দিবি?"

সতীশ কাতর হয়ে বল্লে—"আমার আর কি আছে? জন্ম-জন্ম তোর কেনা-গোলাম হয়ে রইবো।"

ধীরানন্দ সতীশের পিঠ চাপড়ে বল্লে—"আরে এক জন্মেই মুক্তি পেলি তো জন্ম, আবার জন্ম আসে কেমন কোরে? বৃন্দাবনে চলে যা; সেখানে ময়ূর বানর সব এক-জন্মে মুক্তিলাভ করছে দেখতে পাবি।"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বল্লে—"কিন্তু গুরু যে বলেন আমাকে হিমালয় গিয়ে নির্জ্জন বাস করতে। আচ্ছা ভাই, তোর কি মনে হয়? কমলাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, এখনি যদি চলে যাই, তবে তাদের উপর অবিচার করা হবে না?"

ধীরানন্দ একটু হেসে বল্লে—"যদি চাকরিতে একেবারে ইস্তফা দিয়ে পালাও, তবেই অবিচার হবে; না হলে 'সিক্‌লিভ্‌' নিয়ে দিন কতক গা-ঢাকা হোলে এই নানা দুর্ভাবনা থেকে

মুক্তি তো পাবিই, আর একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েও আস্‌তে পারবি।"

সতীশ উৎসাহের সঙ্গে বোলে উঠলো—"তোর কথাতেই রাজি! আজ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে আস্‌বো।"

ধীরানন্দ হেসে বল্লে—"যা কর্‌তে হয় এইখানে বোসে কর্! বাসায় গেলে আবার মনটা 'কিন্তু' কর্‌তে পারে। চল এখন কিছু খাবি।"

সতীশ মাথা নীচু কোরে ভাবতে-ভাবতে সুধীরের পিছনে-পিছনে আখড়ার উঠোন পেরিয়ে একটা পোড়োবাগানের খিড়কির গায়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

১৯

একবার বিয়ে করতেই সতীশের আপত্তি ছিল; কেবল কমলার দেখা পাওয়া গিয়েছিল বোলেই সেবারে দুর্গামণি সতীশকে বাঁধতে পেরেছিলেন। বাধন একটুখানি আল্‌গা হতেই সতীশের বৈরাগ্য-রোগটা আবার দেখ দিয়েছে; এবং আত্মারাম স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই সতীশের ধ[illegible]প্রদীপ ক্রমেই উস্কে তুলে যাচ্ছেন; কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েতে স[illegible]শ ঘাড় পাতবে না, দুর্গামণি বেশ জানতেন; কিন্তু তবু লক্ষ্ণৌয়ের বাস[illegible]য় বোসে না থেকে, জগদীশ-পুরে ফিরে গেলে তিনি যে একটা-কিছু উপ[illegible]য় করতে পারবেন, সেটা তাঁর ধ্রুববিশ্বাস। আর সেই জন্যেই দুর্গামণি সতীশের গুরু-বাড়ী

থেকে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাপড়-চোপড় বাক্স-পেট্‌রা গোছাতে বোসে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। কাছারির ফেরতা বড়-বড় দাড়িওয়ালা নাজির আর কাজিরা আল্‌পাকার জোব্বা আর মোড়াসা মাথায় সরু গলিটার মধ্যে নিজের-নিজের গরীবখানায় ফিরে আস্‌ছে। এক্কাগাড়িগুলো ঝাঁকানি দিতে-দিতে পাথরের রাস্তায় খট্‌-খট্‌-খটাস্‌ শব্দ কোরে আর ঝিন্‌-ঝিন্‌ ঘুঙুর বাজিয়ে কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা সহরের বাইরে চলেছে—টিক্‌টিকির মতো ঝোলা-অবস্থায় তরো-বেতরো সোয়ারী নিয়ে। সতীশদের বাড়ীর সাম্‌নের বাড়ীর লাল কাঠের একটা ছোট বারাণ্ডায় একটা নাচনী নানা-রঙের ওড়না-ঘাঘরায় যেন সবুজ টিয়া পাখীটি সেজে একটা গড়গড়ায় কেবলি টান দিচ্ছে; আর নীচে একটা পানওয়ালার দোকানে চাপকান চুড়িদার-লপেটা-পরা অনেকগুলো মাদ্রাসা-থেকে ছুটি-পাওয়া খান ও খানানের ভিড় জমেছে। রাস্তার ওধারে নবাবী-আমলের একটা ইমামবারা ধুলো আর সন্ধ্যার আলোর মাঝে একটা ঝাপ্‌সা রঙের গম্বুজ দিয়ে অনেকটা আকাশ ঢেকে রয়েছে। দূর থেকে একটা বিউগিল্‌ ভোঁ ভোঁ কোরে একটা একঘেয়ে বিজাতীয় সুর সহরের সব গোলমালের উপরে ছড়িয়ে বাজ্‌তে লেগেছে। দুর্গামণি আপনার বাসার দোতলার গরাদে-দেওয়া জান্‌লার ধারে বোসে সতীশের আসার অপেক্ষা করছেন, এমন সময় সুধীর ওরফে ধীরানন্দ বা ধীরেন-বাবাজী এসে বল্লে—

মা, আপনার কি সমস্ত গোছানো হয়েছে? ও-পাড়ার সতীশ-

বাবুরা ষ্টেশনে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকেও তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

দুর্গামণি একটু অবাক হয়ে বল্লেন—"আর আমার সতীশ এল না? তার সঙ্গে দেখা না কোরে—"

সুধীর আল্‌খাল্লার পকেট থেকে একটা চিরকুট কাগজ বার কোরে দুর্গামণির হাতে দিয়ে বল্লে—"পড়ে দেখুন, সতীশ কি লিখেছে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"তুমি পড়ে শোনাও বাবা, আমি পড়তে পারিনে। সে ভালো আছে তো?"

সুধীর চিঠি পড়তে লাগ্‌লো। চিঠির মর্ম্মটা এই—

"মা, আমি বুঝেছি, তুমি কেন দেশে যাচ্ছ। স্থির জেনো আমি আর সংসার করবো না। তোমার আদেশে আমি প্রথম-সংসার পেতেছিলেম—শুধু তোমার আদেশ বল্লে মিথ্যে বলা হয়, সেবারে আমারো একটু তাড়া ছিল সত্যি—কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্য-রকম। তিনি আমাকে পাকে-চক্রে মুক্ত কোরে দিয়েছেন। এ ক'টা দিন যেন নভেলের ক'টা পরিচ্ছেদ উল্টেপাল্টে পড়ে গিয়েছি! এখন স্বাধীনভাবে জীবনের আসল লক্ষ্য-সাধন করবার আমার সময় এসেছে, বুঝছি। আর গুরুদেবও এই কথা বলেন। সুতরাং তাঁরি আদেশ শিরোধার্য্য কোরে আমি কিছুদিনের জন্যে হিমালয়ের কোনো নির্জ্জন বাসে সাধন-ভজন করতে চল্লেম। আমাকে ক্ষমা কোরো। এই আমার গুরু-ভাই ধীরানন্দ, ইনি তোমায় সতীশ বাবুদের কাছে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক কোরে দিয়েছি। ইতি সেবকাধম সতীশ।"

অত বড় চিঠিখানার মধ্যে কেবল হিমালয় আর সাধন—এই দুটি কথা দুর্গামণি বুঝলেন। আর বুঝলেন, তাঁকে দেশে যেতে হবে, সতীশ আসবে না। এমন কোরে সতীশ পালাবে, দুর্গামণি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি আঁচলে চোখ মুছে চল্লেন। ধীরেন-বাবাজী পোটলা-পুটলি মুটের মাথায় চাপিয়ে এক্কাগাড়ির পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে সতীশের মাকে ষ্টেশনে ওঠাতে সঙ্গে চল্লো।

সতীশের স্বভাবটা বরাবরই কেমন-একটু বৈরিগী-গোছের। হঠাৎ কমলাকে দেখবামাত্র রূপের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল; এবং কমলা আসা অবধি সতীশের বৈরাগ্য-বারিধি প্রেমবারিধি হয়ে একেবারে উছলে উঠেছিল এবং ক্রমেই সংসারের কূলের দিকে তার মনের ঢেউগুলোও এগিয়ে আসছিল, এটা দুর্গামণি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন,এমন আর কেউ নয়। কিন্তু আজ তাঁর লক্ষ্মী-বৌ কমলার চাঁদমুখটি সরে গেছে; সতীশকে নিয়ে তার বৈরাগ্য আর-একবার অকূলের দিকে ফেরবার উপক্রম করছে! ছেলের গলায় আর-একটি সংসার 'না ঝুলিয়ে দিলে সে পালাবে, এটা দুর্গামণি বুঝেই কমলার শূন্য আসনটি আর একটি লক্ষ্মী-বৌ দিয়ে ভর্ত্তি করবার চেষ্টায় দেশের মুখে ছুটলেন—সতীশকে বোঝাবার বা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই।

ওদিকে সতীশ কমলা-সম্বন্ধে নিদারুণ চিঠিটা পেয়েও বিশ্বাস করেনি, কমলা এতটা [illegible]বে! সে মনে-মনে ব্যথা পাচ্ছিল, কিন্তু তবু এক-এক-[illegible]ময় তার ভিতর থেকে কে যেন বলছিল—যা হবার তা তো হয়ে গেল; এখন আর' কেন? বেরিয়ে পড়াই

ভাঁলো! সাধের বাঁধন যখন ছিল, তখন ছিল; কিন্তু এখন যখন সেটা আপনা-হতেই খস্‌লো, তখন বুঝতে হবে সেটা গুরুকৃপা-বলেই ঘটেছে; অতএব এই মহা সুযোগ; আর সংসারে ফেরা নয়! আবার মনে হয়, কমলা কি সত্যি দোষী? একটা বেনামি চিঠির উপরে নির্ভর কোরে তাকে চিরকালের মতো ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়? এক-একবার সতীশ মনে করে, সবিশেষ তদন্ত করার জন্যে একবার তার কালীগ্রামে যাওয়াটা হিমালয় যাওয়ার চেয়ে বেশি দরকারি, কিন্তু তখনি মনে একটা ত্রাস জাগে—গুজবটা যদি সত্যি হয়!

সতীশ এমনি হিমালয় ও কালীগ্রাম দুটোর মধ্যে দুলছে; আর একবার আপিস, একবার খালি বাসা, একবার গুরুর আখড়ায় যাতায়াত করছে।

'ও, আর, আর' গাড়ি পাঞ্জাব-মেলে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গামণিকে জগদীশপুরে নামিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবার হপ্তাখানেক হয়ে গেলেও সতীশ-ছোকরা যেখানকার সেইখানেই রইলো,—এক-পাও হিমাচলের দিকে গেল না। কিন্তু মনটি তার মুক্তির জন্যে ধড়ফড় করছে, সেটা তার মুখ দেখেই আখড়া ও আপিসের সবাই বুঝলে। ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে এলে সতীশ কোন্ দিকে নড়বে,—উত্তর-পূর্ব্বে, না দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সেটা নিয়ে তার পরিচিতদের মহলে, বাজি খেলাও চলতে সুরু হয়ে গেল—সতীশের সামনে এবং আড়ালে।

২০

সতীশ যখন এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায়, সেই সময় ওধারে অরুণ সকালে উঠে কমলার চিঠি বুকের পকেটে নিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের টেবিলে এসে বসলো। এ-আলাপ, সে-আলাপ, খবরের কাগজ, চায়ের পেয়ালা, সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ও সার্সি-বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে এক-সময় ক্ষিতীশ অরুণকে শুধোলে, "এই বৃষ্টিতেই কি অরুণ দেশে যাবে?" অরুণ ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না, একবার সতীশের সঙ্গে দেখা কোরে তবে দেশে যাব।"

ক্ষিতীশ বোলে উঠলো—"লক্ষ্ণৌ যাবে নাকি? সেখানে তো সতীশ বাবু নেই। আমরা সেদিন খোঁজ নিয়ে এলেম, তিনি স্ত্রীর অসুখের ছুতো কোরে তাঁর মাকে নিয়ে জগদীশপুরে চলে গেছেন।"

অরুণ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বোলে উঠলো—"না, আমি জগদীশপুরে যাচ্ছি—সাতটা উনপঞ্চাশের গাড়িতে। দিদিকে একবার বোলে আসি।"

কমলার সঙ্গে দেখা কোরে অরুণ ফিরে এল। হরেনকে বল্লে —"হরেন-দা চল্লুম।" তারপর চটি-জুতোটা চটাস্‌-চটাস্‌ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশ খানিক চুপ কোরে থেকে বল্লে— "অরুণ কি সতীশ বাবুর দেখা পাবেন?"

হরেন বল্লে—"পেতেও পারে।"

ক্ষিতীশ খানিক অন্যমনস্ক থেকে বোলে উঠ্‌লো—"আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ-যাত্রায় অরুণও নিরাশ হবে।"

হরেন কোনো জবাব না দিয়ে আপনার মনে কি ভাবতে লাগ্‌লো।

সকাল সাতটা উনপঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার বেলা দশটায় জগদীশপুরে অরুণকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরুণ তার ব্যাগ আর ছাতাটা প্ল্যাটফরমের সাদা কাঠের রেলিঙের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে একখানা গাড়ীর সন্ধান করতে ফটকের দিকে চলেছে, দেখলে, একদল যাত্রাওয়ালা ষ্টেশনের দুটো কেরাঞ্চি আর চারখানা গোরুর গাড়ি দখল কোরে কাগজের ফুল, সাজ-ঘরের তোরঙ্গ, হারমোনিয়ামের বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফুলুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে-চিবোতে রৈরৈ কোরে চল্লো। সব-শেষে অরুণের চেনা একটা মুটে দুটো এ্যাসেটিলেন গ্যাসের বাতি মাথায় কোরে যাচ্ছিল; সে অরুণকে ডেকে বল্লে—"কালীগাঁয়ে যাবে নাকি বাবু? দেন আমার হাতে ব্যাগটা। গাড়ী পাওয়া যাবে না।"

"জগদীশপুরে যেতে হবে।" বোলে অরুণ মুটেকে ব্যাগটা দিয়ে বল্লে—"সতীশের বাড়ীতে চল্।"

"সতীশ বাবুতো নেই। বাড়ীতে মাঠাকরুণ একলা আছেন।" বোলে মুটে হন্‌হন্ কোরে এগিয়ে চল্লো!

অরুণ একবার ভাবলে—তবে আর গিয়ে কি লাভ? আবার বল্লে—"তাই চল্; মা-দুর্গাকে দেখে না হয় কালীগাঁয়েই যাবো একবার।"

ভাদরের আকাশ মেঘলা হলেও বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। তার উপর সাম্‌নে যাত্রাওয়ালাদের চল্‌তি গাড়িগুলো মেটে রাস্তায় বিষম ধুলো উড়িয়েছে। অরুণ যাত্রার অধিকারীকে অভিশাপ দিতে-দিতে চলেছে। তার মুটে সদর-রাস্তা ছেড়ে হাঁটা-পথে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে গেছে, তার আর দেখা নেই। এমন সময় সাম্‌নের একখানা কেরাঞ্চি গাড়ি চাকা-ভেঙে হঠাৎ রাস্তার মাঝে কাৎ হয়ে পড়লো। গাড়ীর ছাদ থেকে গোটাকতক ফুলুট ক্লারিওনেট আপনার-আপনার বাক্স ছেড়ে এবং গাড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের আসন ছেড়ে গোটা-ছয়েক ছোকরা এবং আধা-বয়সী যাত্রার দলের বাবু পানের পিক্‌মাখা সার্ট আর পমস্থ নিয়ে ছিট্‌কে ধুলোয় পড়লো। অরুণ এই দুর্ঘটনার দিকে দৃকপাত না কোরে হন্‌হন্ কোরে সোজা বেরিয়ে গেল। তারপর আর-এক-সময়ে অরুণ দেখলে, রাস্তার ধারে আর-একটা ঠিকে-ঘোড়া যোত ছিঁড়ে কেবলি লাথ্ ছুঁড়ছে আর গাড়ির মধ্যেকার লোকগুলো কেবলি ঘোড়া আর গাড়োয়ানকে গাল পাড়ছে; কেউ বা গানও ধরেছে। এমনি নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে ধুলোয় আর ঘামে মিলিয়ে একটা আধ্‌শুকনো আধ্-ভিজে চেহারা নিয়ে অরুণ গ্রামে পৌঁছলো!

গ্রামের একটিমাত্র রাস্তা: তারি দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, পঞ্চাননতলা, ঠিকেগাড়ির আস্তাবোল, ইস্কুল-বাড়ি, ডাক্তারখানা সমস্তই—মায় একটা চেরিটেবেল্ ডিস্পেন্‌সারি—যেখানে কুইনাইনের বদলে ময়লা ময়দার গুঁড়ো দেওয়া হয়; আর

একটা "জগদীশ হল ও পাবলিক্ লাইব্রেরী এণ্ড ক্লব!" সেখানে প্রবন্ধ্ পাঠ, বারোয়ারি পূজো, করপোরেসন মিটিং, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গলায় মাল্যদান ও ওইদিন থিয়েটার যাত্রা বা বায়স্কোপে স্ত্রীস্বাধীনাতাও কখনো-কখনো হয়ে থাকে।

অরুণ তেতে-পুড়ে এই লাইব্রেরীর গায়ে সতীশের বাড়ীর সদর দরজায় এসে দেখ্লে তার মুটে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ একবার দরজাটায় নাড়া দিয়ে একটা হাঁক দিলে—"মা-দুর্গা ঘরে আছেন?"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'তিন বার হেঁকেও যখন কারু সাড়া পেলে না, তখন মুটের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে—"তুই যে বল্লি মা ঘরে আছেন?"

মুটের উত্তর হলো—"আছেন কিন্তু সকাল থেকে জ্বরে বেহোঁস!"

"এতক্ষণ বলতে হয়রে গাধা!" বোলে অরুণ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে, বাড়ীর মধ্যে দাওয়ার উপরে ব্যাগটা রেখে, ভাড়ার পয়সা মুটের হাতে দিয়ে, অরুণ লোকটাকে একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্তে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকলো।

অন্ধকার ছোট ঘরটির মধ্যে দুর্গামণি শুয়েছিলেন। অরুণ গিয়ে আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিতে চমকে উঠে দুর্গামণি বোলে উঠলেন—"কে সতীশ?"

অরুণ তাঁর কাছে সরে বোসে বল্লে—"সতীশ তো নয়, আমি এসেছি, মা-দুর্গা!"

"অরুণ!"—বোলে দুর্গামণি তাঁর রোগা হাতখানি অরুণের কোলে ফেলে শুধোলেন "বাড়ীর সব ভালো? আমার—" বোলেই সতীশের মা চুপ করলেন একফোঁটা জল চোখের কোণে গড়িয়ে এল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো—"তোমার বৌমা ভালো আছেন, ভেবোনা। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; হরেনদাদা দ্যাখে—রাস্তায় বোসে কাঁদছে। সে আর তার বন্ধু ক্ষিতীশ তাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে!"

দুর্গামণি অরুণের দিকে চেয়ে শুধোলেন "—এখন বৌমা?"

"এখন দিদি আমারি কাছে আছে।" বোলেই অরুণ চাদরে একবার নিজের মুখটা বেশ কোরে মুছে নিলে।

দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে সে গুজোবটা?"

"সবই মিথ্যা!" বোলেই চট-কোরে অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি একবার বাইরে দেখি ডাক্তার এল বুঝি।"

দুর্গামণির সাম্‌নে বোসে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে অরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে তবে ঘরে ঢুকলো এবার। ডাক্তারের মুখে অরুণ শুনলে, দুর্গামণির টাইফয়েড; কেউ নর্স না করলে চলবে না। এটুকুও ডাক্তার বল্লেন যে একটু দুর্নামের দরুণ পাড়ার মেয়েরা কেউ এঁর সেবা করতে রাজি নয়। ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বোলে উঠলো—"সে-কথা থাক। আজ রাতটার মতো আপনি আপনার হিন্দুস্থানী দাসীটাকে

এঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আজই কলকাতা থেকে নর্স আনতে চল্লুম। আমার আসা পর্য্যন্ত আপনি এঁকে দেখবেন কিনা বলুন?”

“নিশ্চয় দেখবো!” বোলে ডাক্তার চলে গেলেন।

ডাক্তারকে বিদায় কোরে অরুণ দুর্গামণির কাছে এসে বল্লে—“মা, সতীশের ঠিকানাটা কি? তাকে তার করতে হবে!”

দুর্গামণি বল্লেন—“সে তো তার পাবেনা; বিবাগী হয়ে কোথায় হিমালয় গেছে।”

অরুণ বল্লে—“তবে উপায়? আমি তোমার জন্যে কলকাতা থেকে নর্স আনিগে।”

নর্সের কথা শুনেই দুর্গামণি ভুরু কুঁচকে বল্লেন—“না, না, নর্স কাজ নেই! তোরা কেউ—”

অরুণ দুর্গামণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুধোলে—“দিদিকে আনবো মা-দুর্গা?”

“সেই ভালো!” বোলে দুর্গামণি চোখ বন্ধ কোরে আস্তে বল্লেন—“বৌমাকে বলিস, আমি গুজোব-কথা, বেনামি-চিঠিতে একটুও বিশ্বাস করিনি, করবোও না। সতীলক্ষ্মী আমার বৌ!”

অরুণের চোখ ছল্-ছল্ কোরে এল। সেই সময় ডাক্তারের দাসী রামদাসিয়া এসে উপস্থিত দেখে অরুণ বল্লে—“আজ রাতের মতো এই দাসীটাকে তোমার কাছে রেখে যাই; কাল দিদিকে এনে দিচ্ছি। আমার ব্যাগটা এইখানেই রইলো।”

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

New Artistic Press, Calcutt

দুর্গামণির পায়ের ধূলো নিয়ে অরুণ বেরোবে, দুর্গামণি রাম-দাসিয়াকে বল্লেন—"ও-ঘরে বাতাসা আর ডাব আছে, অরুণকে আবার খেয়ে যেতে বল্।"

দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অরুণ দু-খানা বাতাসা চিবিয়ে ডাবের সমস্ত জলটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সোজা আবার ষ্টেশনের দিকে চল্লো।

পব্‌লিক লাইব্রেরীর কাছটায় অরুণেব বন্ধু যতীন একটা এসেটিলিনের হাঁড়া খাটাতে ব্যস্ত ছিল; অরুণকে দেখে বোলে উঠলো—"কিরে কোথায় চলেছিস্? শুকনো দেখি যে! খবর কি? পড়াশুনা চলছে কেমন? আজ রাতে বারোয়ারি পূজো; যাত্রা হবে; আসিস্—বুঝলি!" এমনি নানা প্রশ্নের অরুণ একটি-মাত্র উত্তর দিয়ে গেল—"মা-দুর্গার বড় অসুখ।"

২১

অরুণের মুখে শাশুড়ীর ওই দুর্দ্দান্ত অসুখের কথা শুনে কমলার দুচক্ষু ছল্ ছল্ কোরে এল। এবং, বিশেষ কোরে, সে যখন জানালে যে জামাই বাবু নিরুদ্দেশ, হয় ত বা তিনি এখন হিমালয়ের কোন্ গুহার মধ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, এবং তাঁকে একটা সম্বাদ দেওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়, তখন সেই দুটি চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ধারা বেয়ে নেমে এল।

হঠাৎ কি কারণে যে সতীশ সংসার ত্যাগ কোরে চলে গেল,

এ-কথা মনে মনে সবাই বুঝ্‌লে, কিন্তু, মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

অরুণ বল্‌লে, শুধু কি এই? ডাক্তারের কাছে শুনে এলুম দুর্নামের ভয়ে পাড়ার কেউ শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করতে রাজি নয়। একেই ত ওদের গ্রামে মানুষের চেয়ে জানোয়ারই বেশি, তার ওপর যদি এই উৎপাত হয় ত বুড়ী বে-ঘোরেই মারা যাবে।

কমলা আঁচলে চোখ মুছে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে হাঁ অরুণ, মা কি তবে একলাই পড়ে আছেন? মুখে একফোঁটা জল দেবারও কি কেউ নেই?

অরুণ বল্‌লে, অবস্থা ত তাই বটে,—আমাকে ত একরকম দোর ভেঙেই বাড়ী ঢুক্‌তে হয়েছিল, তবে, আজ রাতটার মত একটা বন্দোবস্ত কোরে এসেচি, ডাক্তার বাবু তাঁর হিন্দুস্থানী দাসীটাকে পাঠিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন।

যাক্, বাঁচা গেল! বোলে হরেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, রাতটা ত কাটুক;—ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেণ আছে, আমরা তাইতে বেরিয়ে পড়্‌লে সকাল নাগাদ কমলাকে পৌঁছে দিতে পারবো

ক্ষিতীশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ কোরেই ছিল, মুখ তুলে বল্‌লে, কমলাকে নিয়ে যাবে? হঠাৎ ওঁকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে হরেন?

বাঃ,—সুবিধে হবে না? সতীশ যখন নেই, তখন, শাশুড়ীর

সমস্ত দায়িত্ব ত এখন ওরই। তা'ছাড়া দেখ্‌বে কে? শুন্‌লে ত গ্রামের মেয়েরা দুর্নামের ভয়ে বুড়ার কাছে ঘেঁস্‌তে পর্য্যন্ত রাজি নয়। কে সেবা করে, বল ত?

ক্ষিতীশ লোকটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও নয়, আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করাও তার স্বভাব নয়, কিন্তু ভিতরের একটা গোপন বেদনা কিছুদিন থেকে ওই দিকের দৃষ্টিকে তার অত্যন্ত প্রখর কোরে তুলেছিল, সে ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে বল্‌লে, কথাটা ঠিক সত্য নয়, হরেন। আমার মনে হয় তাঁর অসুখের খবর পাড়ার মেয়েরা জানেন না। কারণ আমার নিজের বাড়ীও ত পল্লীগ্রামে, সেখানে বাপের বাড়া থেকে বৌ হারিয়ে গেলে শাশুড়ীর জাত যেতে আমি আজও দেখিনি, এবং এই দোষে পাড়ার মেয়েরা পীড়িতের সেবা করেন না, এত-বড় কলঙ্কও তাঁদের দেওয়া চলেনা হরেন।

অভিযোগটা হরেনের নিজের গায়েও বিঁধল। সে লজ্জিত মুখে জবাব দিলে, বেশ ত ক্ষিতীশ, সেবা না হয় তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু তাই বোলে এত-বড় একটা টাইফয়েড রোগের সেবাও তাঁরা নিয়মিত কোরে যাবেন, এত-বড় বোঝাও ত তাঁদের চাপানো যায় না, ভাই।

ক্ষিতীশ বল্‌লে, ওটা যে টাইফয়েড তাও নিশ্চয় বলা যায় না। অন্ততঃ, একটা দিনের জ্বরকে অত-বড় একটা নামের ঘটা দিয়ে না ডাকাই ভাল হরেন।

হরেন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলে, তাহলে কি করা যায় বল?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণ বড়দের কথায় কথা কয়নি, চুপ কোরেই শুন্‌ছিল, এবার বোলে উঠলো, দিদির শাশুড়ী সকাল থেকে জ্বরে বেহুঁস, এই আমি শুনে এসেচি, কিন্তু জ্বরটা যে কেবল আজই হয়েছে তাও ত জানিনে। হয় ত বা ক'দিন থেকে—

ক্ষিতীশ কথাটা তার শেষ করতেও দিলে না, কাণেও নিলে না, বল্‌লে, তা'ছাড়া একটা বড় কথা আছে হরেন। তাঁর সামান্য জ্বর হয়ত দু'চার দিনেই সেরে যাবে, কিন্তু মাঝখানে সহসা কমলাকে নিয়ে গেলে পল্লীগ্রামে কত-বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবে দেখ দিকি? সতীশের মা জ্বরের ঘোরে হয়ত বলেছেন যে তিনি কমলার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না, কিন্তু—

কিন্তুটা ওইখানেই থেমে গেল। অরুণের মত ক্ষিতীশের নিজের বক্তব্যটাও শেষ হতে পেলে না; কমলা এতদূর পর্য্যন্ত নীরবে শুন্‌ছিল, হঠাৎ তার কান্না যেন একেবারে সহস্রধারে ফেটে পড়ল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে বোলে উঠলো,—কিন্তু কি ক্ষিতীশ-দা'? আমাকে কি তোমরা এইখানেই বেঁধে রাখতে চাও? আমার শাশুড়ীর ব্যামো, তিনি কাছে নেই, আমি না গেলে কে যাবে, বল ত?

ক্ষিতীশ হতবুদ্ধি হয়ে বল্‌তে গেল, তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে—

কমলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, ভেবে কি দেখ্‌তে

চাও, শুনি? কেবল ভেবে ভেবেই ত আজ আমার এই দশা করেছ। হরেনের মুখের দিকে চোখ্ তুলে বল্‌লে, আমি দোষ করিনি,—আমার ভালর জন্যে যদি তোমরা অত ফন্দি-ফিকির না কোরে সোজা আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে ত, আজ হয়ত আমার ভালই হতো, তোমাদেরও আমার জন্যে এমন ভেবে সারা হতে হতোনা। আমি আর তোমাদের সাহায্য চাইনে, কেবল অরুণকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই চলে যাবো। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হোক্, তোমরা আর আমার ভালর চেষ্টা কোরোনা।

ক্ষিতীশ এবং হরেন দুজনেই চম্‌কে গেল। কমলাকে এমন কোরে কথা বল্‌তে কেউ কখনো শোনেনি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তার নিজের ব্যক্তিগত যে কোন মতামত আছে; আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া, এবং তার সংশোধনের সমস্ত ভার অপরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন সেও যে আবার মনে মনে কিছু চিন্তা করে, একথা তারা দুজনেই যেন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিল।

হরেনের মুখে সহসা কোন উত্তর যোগাল না, এবং ক্ষিতীশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত কোরে চেয়ে রইল। কিন্তু এ-কথা বুঝ্‌তে আর তাদের বাকি রইলোনা, যে তাদের উভয়ের সম্মিলিত দুশ্চিন্তাকেও বহুদূরে অতিক্রম কোরে আর একজনের উদ্বেগ কোথায় এগিয়ে গেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বল্‌লে, তোমরা

মনে কোরোনা ক্ষিতীশ-দা', তোমাদের দয়া আমি কোনদিন ভুলতে পারবো, কিন্তু আজ তোমাদের হাত জোড় কোরে জানাচ্চি ভাই,—বল্‌তে বল্‌তেই তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর কোরে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবার সে জল সে মোছবার চেষ্টাও করলেনা, হাত-দুটি জোড় কোরে বলতে লাগ্‌ল—আমার জন্যে তোমরা যে কত দুঃখ পেলে, সে আমি জানি, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু আর একটা দিনও না। আজ থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত ভারই আমি নিজের মাথায় তুলে নিলুম। ক্ষিতীশ-দা', একদিন যেমন আমাকে তুমি পথ থেকে এনে বাঁচিয়ে ছিলে, আজ তেমনি আমাকে কেবল এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর, এর থেকেও একটা যেন কোথাও কূল পাই,—আর না তোমাদের দুঃখ দিতে ফিরে আসি!

ক্ষিতীশ চোখ ফিরিয়ে বোধ হয় তার চোখের জলটাই গোপন করলে, কিন্তু হরেন বল্‌লে, আমরা দুজনে সেই আশীর্ব্বাদই তোকে করি কমলা, আমি বল্‌চি এ বিপদ একদিন তোর কেটে যাবেই,—কিন্তু কাল সকালে আমিও কেন তোর সঙ্গে যাইনে?

কমলা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরেন উত্তেজনার সঙ্গে বোলে উঠলো, না কেন কমলা? আমি যদি তোর সত্যিকারের দাদা হতুম তা'হলে ত তুই না বল্‌তে পারতিস্‌নে।

তার শেষ কথাটায় এত দুঃখেও কমলার মুখখানি লজ্জায়

রাঙা হয়ে গেলো, সে অধোমুখে তেম্‌নি নীরবে মাথা নেড়ে বল্‌লে, না।

তার এই লজ্জাটা হরেনের অগোচর রইল্‌ না। কিন্তু পরস্পরের নাম নিয়ে এই যে একটা লজ্জাকর অপবাদ, একে সে যে বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না, এই কথাটাই সদর্পে জানাবার জন্যে হরেন তীব্রকণ্ঠে বোলে ফেললে, তুই কি ভাবিস্‌ কমলা, আমি মিথ্যে দুর্নামকে ভয় করি? বাবার অন্যায় শাসন গ্রাহ্য করি? আমি যাবো তোর সঙ্গে, দেখি, গ্রামের কে আমার মুখের সাম্‌নে তোকে কিছু বল্‌তে পারে। তার জবাব আমি দিতে পারবো, কিন্তু ছেলেমানুষ অরুণ পারবে না।

কমলা সজল চোখ দুটি তার মুখের পানে তুলে বল্‌লে, অরুণ পারবে না সত্যি, কিন্তু তোমারও পেরে কাজ নেই হরেন-দা'। আমার বোঝা আমাকে বইতে দাও, আর আমার সমস্যাকে তোমরা জটিল কোরে তুলোনা।

হরেন বল্‌লে, গ্রামের লোকগুলোকে একবার ভেবে দেখ্‌ কমলা। সেখানে একাকী তোর অদৃষ্টে কি যে না ঘট্‌তে পারে, সে তো আমি ভেবেও পাইনে!

কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ছিল। সে আর কথা কাটাকাটি না কোরে শুধু উপরের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বল্‌লে—তিনিই জানেন। এই বোলে সে হাতদুটি মাথায় ঠেকিয়ে উদ্দেশে কাকে যেন প্রণাম কোরেই, দ্রুতপদে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল!

কয়েক মুহূর্ত্ত কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বার হোলোনা, সবাই যেন নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে অরুণ বল্‌লে, আমি কিন্তু একটা সুবিধে কোরে এসেছি হরেন-দা'। জামাই বাবুর মাকে বোলে এসেছি, দিদি হারিয়ে যাবার পরে অসুখ থেকে সেরে উঠে পর্য্যন্ত বরাবর আমার কাছেই আছেন। ঠিক করিনি ক্ষিতীশ-দা'? অবশ্য তোমাদের নামও করেছি বটে।

হরেন বল্‌লে, দূর পাগ্‌লা! তুই ছেলেমানুষ,—কল্‌কাতায় কমলা তোর কাছে আছে, এ-কথা কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে? কি বল হে ক্ষিতীশ?

ক্ষিতীশ হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, হুঁ। বোলেই লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বল্‌লে, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে হরেন, আমি চল্লুম। বোলে ঠিক যেন টল্‌তে টল্‌তে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের বাড়ীতে তাদের কোন খেয়াল না কোরে ক্ষিতীশ শুতে গেল, এটা তার স্বভাবের এম্‌নি বিরুদ্ধ যে হরেন ও অরুণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কিন্তু যথার্থই আজ ক্ষিতীশের এদিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্যই ছিলনা। বহুক্ষণ থেকেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এত আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অর্দ্ধেক বোধ হয় তার কাণেই যায়নি। সেখানে কেবল একটা কথাই বারম্বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল,—সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে! তার মনের নিভৃত গুহায় যত-কিছু পাপ

সঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কমলার কাছে সমস্ত ধরা পড়ে গেছে,— তার কোথাও কিছু আর লুকোনো নেই! তাই সে আজ ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে চায়! আজ তার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক!

২২

ক্ষিতীশ-দা'!

কে?

আমি কমলা, একবারটি দোর খোল।

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দোর খুলে বাইরে এসে দেখ্‌লে সুমুখে দাঁড়িয়ে কমলা। রাত্রির ঘোর তখনো কাটেনি, তখনো কালো আকাশে দু'চারটে বড় বড় তারা জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্বল্‌চে। কেবল পূবের দিকটা একটু স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। বারান্দার এককোণে যে লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ কোরে জ্বলছিল, তারই অস্পষ্ট আলোতে ক্ষিতীশ চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে।

কমলার গায়ে আগাগোড়া একটা হল্‌দে রঙের র‍্যাপার জড়ানো, এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণ। তার ডোরা-কাটা কোটের ওপর কোমরে বাঁধা একটা আধময়লা চাদর। বাঁ-হাতে তার পৈতের সময়কার লাল রঙের ছাতাটি এবং ডান বগলে চাপা একটি ছোট্ট পুঁটুলি।

কেবল এতটুকুই ক্ষিতীশ দেখ্‌তে পেলে। কিন্তু কমলা

যখন গড় হয়ে প্রণাম কোরে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, ক্ষিতীশ-দা', আমি চল্‌লুম, তখন আলোর অভাবেই হোক্, বা চোখের দোষেই হোক্, তার মুখের কিছুই আর ক্ষিতীশের চোখে পড়্‌ল না। তার মনে হ'ল, অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে যেন সম্মুখে, পাশে, ওপরে, নীচে সমস্তটাই একেবারে মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে।

—আমাদের সময় হয়েছে আমি যাচ্চি ক্ষিতীশ-দা'।

—যাচ্চো? আচ্ছা—

—আমি কোথাকার কে, তবু কত কষ্টই না এতদিন ধোরে তোমাকে দিলাম—এই বোলে কমলা র‍্যাপারের কোণে চোখ মুছ্‌লে।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ শুধু কেবল জবাব দিলে, কষ্ট? কই, নাঃ—

—কিন্তু তোমার প্রাণ বাঁচানো যেন নিষ্ফল না হয়, যাবার সময় আমাকে এইটুকু আশীর্ব্বাদ কেবল তুমি কর ক্ষিতীশ-দা'—এই বোলে কমলা ঘন ঘন চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ কোন উত্তরই খুঁজে পেলে না। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ বোলে উঠ্‌লো, আশীর্ব্বাদ? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা' করচি বই কি! হাঁ অরুণ, মোটরটা বোলে দেওয়া হয়েছে?

অরুণ মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হাঁ, হরেন-দা' ত নীচে তাতেই বসে আছেন! তিনি ইষ্টিশন পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন! আপনি যাবেন না?

আমি? না ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—

কমলা দূর থেকে আর একবার নিঃশব্দে নমস্কার কোরে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল। অরুণ কাছে এসে বল্‌লে, আমিও চল্‌লুম ক্ষিতীশ-দা'—এই বোলে সে দিদির মত প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষিতীশ সহসা সজোরে তার হাতদুটো ধোরে হিড় হিড় কোরে টেনে তার ঘরের মধ্যে এনে ফেলে বল্‌লে, অরুণ, তোমরা সত্যি সত্যিই চল্‌লে ভাই?

অরুণ অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল, প্রশ্নটা যেন সে বুঝ্‌তেই পারলে না।

ক্ষিতীশ পুনশ্চ বল্‌লে, কে জানে, আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না,—আমিও আজ দুপুরের গাড়ীতে পশ্চিমে চল্‌লুম ভাই।

অরুণ এ-কথারও জবাব দিতে পারলে না, কিন্তু বালক হলেও সে এটুকু বুঝ্‌তে পারলে যে ক্ষিতীশ-দা'র কণ্ঠস্বর কান্নার জলে যেন একেবারে মাথামাখি হয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বল্‌লে, তুমি ছেলে-মানুষ, তোমার ওপর যে কত-বড় ভার পড়্‌ল, এ হয়ত তুমি জানোওনা, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের যাত্রাটা যেন তিনি সকল প্রকারে নির্বিঘ্ন কোরে দেন।

এই বোলে সে তার বালিশের তলা থেকে একখান খাম বার কোরে অরুণের হাতে গুঁজে দিতে গেল। অরুণ হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, এ কি ক্ষিতীশ-দা'?

সামান্য গোটা-কয়েক টাকা আছে অরুণ।

কিন্তু ভাঁড়ার টাকা ত আমার কাছে আছে ক্ষিতীশ-দা'।

তা' থাক। তবু ছোট ভাইদের যাবার সময় কিছু হাতে দিতে হয়।

এই বোলে সে অরুণের কোঁচার খুট্টা টেনে নিয়ে তাতে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লে, তোমার ত কেউ বড় ভাই নেই অরুণ, তাই জানো না, নইলে তিনিও এম্‌নি কোরেই বেঁধে দিতেন, দাদার স্নেহের উপহার বোলে নিতে কিচ্ছু লজ্জা কোরো না, ভাই। তোমার দিদি কখনো যদি জান্‌তে পেরে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও এই কথাটাই বোলো। এই বোলে সে সেটা যথাস্থানে পুনরায় গুঁজে দিয়ে হাত ধোরে তাকে বাইরে এনে বল্‌লে, আর সময় নেই অরুণ, তুমি যাও ভাই, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ওঁরা বোধ করি বড্ড ব্যস্ত হচ্চেন—এই বোলে সে একরকম তাকে জোর কোরে বিদায় কোরে দিলে।

অরুণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কতদিন পশ্চিমে থাক্‌বেন ক্ষিতীশ-দা' ?

সে-কথা আজ কি কোরে বোল্‌ব ভাই ?

মিনিট-খানেক পরে অরুণ গিয়ে যখন গাড়ীতে উঠে বোস্‌লো, তখন তাকে একাকী দেখে কমলা কোন প্রশ্নই কর্‌লে না, কিন্তু হরেন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিতীশ এলোনা অরুণ !

তার জবাবটা ক্ষিতীশ নিজেই দিলে। সে উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্‌লে, শরীরটা আমার ভাল নেই হরেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবোনা।

হরেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লে, ভাল নেই? তা'হলে হিমে আর দাঁড়িয়ো না ক্ষিতীশ, ঘরে যাও, আমি এদের পৌঁছে দিয়ে এসে তোমাকে জানাবো।

মোটর ছেড়ে দিলে। হরেনের উপদেশ তার কাণে গেল কি না কে জানে, কিন্তু গাড়ী যখন বহুক্ষণ তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও সে তেম্‌নি সেই দিকে চেয়ে তেম্‌নি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

ষ্টেশনে পৌঁছে, টিকিট কিনে দুজনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে হরেন কমলার কাছে গিয়ে একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বল্‌লে, আমার উপস্থিত ঠিকানা যদিচ আমি নিজেই জানিনে, তবুও আমাকে খবর দেবার যদি আবশ্যক হয়ত কেয়ার অফ্‌—

অরুণ পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটুক্‌রো কাগজ আর পেন্‌সিল বার কোরে বল্‌লে, থামো থামো হরেন-দা', ঠিকানাটা তোমার লিখে নিই। তা ছাড়া শুন্‌লুম ক্ষিতীশদা'ও আজ দুপুরের ট্রেণে পশ্চিমে চলে যাচ্ছেন, এটা ছাই মনে হোলোনা যে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেসা কোরে রাখি।

সংবাদ শুনে কমলা মনে মনে আশ্চর্য্য হোলো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলে না। কিন্তু হরেন উদ্বিগ্ন হয়ে বোলে উঠ্‌লো, বলিস্‌ কি অরুণ! তা'হলে ত আমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে হয়!

কমলা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কেন হরেন-দা'?

অরুণ বল্‌লে, কেন কি, বাঃ—

হরেন বল্‌লে, সেখানে কত কি ঘট্‌তে পারে কে বল্‌তে পারে? আবশ্যক হলে আমি ত যাবই, এমন কি ক্ষিতাশকে পর্য্যন্ত ধোরে নিয়ে যেতে ছাড়্‌বো না! তুই কি আমাকে ভীরু মনে করিস্‌!

কমলা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না, তা করিনে। কিন্তু তোমাদের কারও সেখানে আমার জন্যে যাবার দরকার হবে না।

হরেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, হবেনা? নাই হোক্‌, কিন্তু আজও কি তুই আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে চিনিস্‌ নি কমলা?

কমলা এ-প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে না, বল্‌লে, আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে হরেন-দা', এতদিন কি কোরে আমার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, আর কেমন কোরেই বা এতদিন নিজের কাজের ভার তোমাদের পরের ওপর নির্ভর কোরে থাক্‌তে পেরেছিলুম! ভুল যা করেচি তার সীমা নেই, কিন্তু তোমাদের সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠাবো এতবড় ভুল বোধ হয় আমিও আর কোর্‌ব না! এই বোলে সে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে কাগজের টুক্‌রোখানি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

হরেন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, কিন্তু কমলা, নির্দ্দোষীকেও কি সাক্ষী দিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে হয় না?

কমলা একটুখানি ম্লান হেসে বল্‌লে, সে আদালতে হয়; কিন্তু আমার বিচারের ভার আমি যাঁর হাতে তুলে দিয়েচি হরেন-দা', তাঁকে সাক্ষী যোগাতে হয় না, তিনি আপনিই সব জানেন।

এই বোলে সে উদ্গত অশ্রু গোপন করতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান নেড়ে দিলেন, ড্রাইভার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে, এই সময়টুকুর মধ্যে হরেন যেন একটা ধাক্কা সাম্‌লে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসেও কমলার মুখ আর দেখ্‌তে পেলে না কিন্তু তাকেই উদ্দেশ কোরে চেঁচিয়ে বল্‌লে, তাই যেন হয় বোন্, আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি তিনিই যেন আমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন!

কমলা এ-কথারও কোন উত্তর দিলে না, দেবার ছিলই বা কি! কিন্তু গাড়ী কতকটা পথ চলে গেলে সে কেবলমাত্র একটিবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে পেলে হরেন তখনও সোজা তাদের দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মধ্যে অরুণ অনেক কথাই বকে যেতে লাগ্‌লো। তার নিজের প্রতি ভারি একটা ভরসা ছিল। সেই যে দুর্গামণি তাকে বলেছিলেন, তিনি গুজবটা বিশ্বাস করেন নি, এবং সেও তাঁকে জানিয়ে এসেছে কলকাতায় দিদি তার কাছেই আছেন, এতেই তার সাহস ছিল দুর্ঘটনাকে সে অনেকখানিই সহজ কোরে দিয়েচে। এই ভাবের সান্ত্বনাই সে থেকে থেকে দিদিকে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু দিদি যেমন নিঃশব্দে ছিল, তেম্‌নি নীরবেই বসে রইল। হরেন্দ্রর সেই কথাটা সে ভোলেনি যে অরুণের এই কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না! কিন্তু এজন্য মনের মধ্যে তার বিশেষ কোন চাঞ্চল্যও ছিল না। বস্তুতঃ, যা সত্য নয় সে যদি লোকে

অবিশ্বাসই করে ত দোষ দেবার কাকে কি আছে! কিন্তু যথার্থ যে-চিন্তা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জাঁতার মত চেপে বস্‌ছিল সে তার শাশুড়ীর কথা। তিনি বলেছিলেন বটে তাঁর বধূর কলঙ্ক তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিশ্বাস কি তাঁর শেষ পর্য্যন্ত অটুট্ থাক্‌বে? কোথাও কি কোন অন্তরায় কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না? সে জান্‌তো, ঘট্‌বে। পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েই সে এতবড় হয়েছে, তাদের সে চেনে,—কিন্তু এ সঙ্কল্পও তার মনে মনে একান্ত দৃঢ় ছিল, অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তিই হয়ে গেছে, কিন্তু আর সে তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মান্‌বে না। এ-সম্বন্ধ যদি ভেঙেও যায় ত যাক্, কিন্তু জগদীশ্বর ভিন্ন দুজনের মাঝখানে অন্য বিচারক সে কখনো স্বীকার করবে না।

বেলতলি ষ্টেসনে যথাসময়েই ট্রেণ এসে পৌঁছল, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী জোগাড় করা সহজ হোলোনা। অনেক চেষ্টায় অনেক দুঃখে অরুণ একটা সংগ্রহ কোরে নিয়ে এল। অশ্বযান যখন জগদীশপুরের সতীশ রায়ের বাটীর সুমুখে উপস্থিত হল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে।

দুর্গামণি গোটা-তিনেক ময়লা, ওয়াড়হীন তূলো-বার-করা বালিশ জড় কোরে ঠেস্ দিয়ে বসে একবাটি গরম দুধ পান করছিলেন, এবং অদূরে মেঝেয় বসে পাড়ার একটি বিধবা মেয়ে কুলোয় খৈয়ের ধান বাচ্‌ছিল। দুর্গামণির জ্বর তখনও একটু ছিল বটে, কিন্তু টাইফয়েডের কোন লক্ষণই নয়। তিনি অরুণকে

দেখে খুসি হয়ে বল্লেন, কে অরুণ এসেছো, বাবা? এসো, বোসো,—দোর-গোড়ায় ও কে গা?

দিদি এসেছেন—

দিদি? কে, বউমা?

পরক্ষণেই কমলা ঘরে ঢুকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিতলে গড় হয়ে প্রণাম করতেই দুর্গামণি শশব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। দুধের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি বোলে উঠলেন, থাক্ থাক্, বঁউমা, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। সারাদিন পরে দুধ ফোঁটা টুকু মুখে তুলেচি, এটুকু আর ছুঁয়ে দিয়ো না।

যে মেয়েটি পৈখে বাচ্‌ছিল সে স্পর্শ বাঁচিয়ে কুলো-সমেত দুহাত সাম্‌নে এগিয়ে গেল। কমলা নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু অরুণ যেন একেবারে অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলে উঠে বোলে ফেল্‌লে,—মিথ্যেবাদী! কেন তবে কাল তুমি বল্‌লে, ও-সব গুজব তুমি বিশ্বাস করোনা। কেন বল্‌লে—

শোন কথা! কবে আবার বল্‌লুম বিশ্বেস করিনে? আর জ্বরের ধমকে যদি কিছু বোলেই থাকি ত সে কি আবার ধর্ত্তব্যি, বাছা!

অরুণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লে, তা'হলে ত আমি কখ্‌খনো দিদিকে আন্‌তুম না! দুর্গামণি দুধের বাটিটি সরিয়ে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে বল্‌লেন, তা' বেশ ত বাছা, অমন মার্-মুখী হোচ্চো কেন? শাণ্ডেল মশাই আসুন, রায় বট্‌ঠাকুরকে খবর দি,—ততক্ষণ, ঘরে সবই আছে, পটলের-মা বের কোরে দিক্,

—দোরের উনুনটায় বোক্‌নোয় কোরে ডাল-চাল দুটো ফুটিয়ে তোমাকেও দুটো দিক্‌, নিজেও দুটো খাক্‌।

অরুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠে বল্‌লে, কি! আমরা তোমার বাড়ী ভিক্ষে নিতে এসেচি! এত বড় কথা বল তুমি! আচ্ছা, টের পাবে! এই বোলে সে কমলার হাতখানা চেপে ধোরে বল্‌লে, চল দিদি, আমরা যাই,—এখনো আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—আর এক মিনিটও এর মুখ দেখ্‌তে চাইনে!

কমলা ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি মুক্ত কোরে নিয়ে বল্‌লে চল, যাচ্চি ভাই। তার পরে মাথার অঞ্চলটা সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চেয়ে শান্ত সহজ কণ্ঠে বল্‌লে, মা, আমি চল্‌লুম, কিন্তু, আমিও এ বাড়ীর বউ, তোমারি মত এও আমার শ্বশুরের ভিটে। কিন্তু এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ-বাড়ীতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়!

শাশুড়ী বল্‌লেন, তা' কি জানি, বাছা!

কমলার মলিন চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল,—বোধ হয় কি যেন সে বলতেই চাইলে, কিন্তু সে অবসর আর পেলে না। অরুণ বজ্র-মুষ্টিতে হাত ধোরে জোর কোরে তাকে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

বৈরাগ্য-জিনিষটা কল্পনায় যতখানি সুন্দর ব'লে মনে হয়, আসলে তার সৌন্দর্য্য যে ঠিক ততখানি ভোগ করা যায় না,

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

New Artistic Press, Calcutta.

দিনকতক বৃন্দাবনে থেকে সতীশ তা বিলক্ষণ-রূপেই টের পেয়ে গেল !

সমুদ্রের ঝড়ের দোলায় নৌকা যেমন স্থির থাক্‌তে পারে না, বিক্ষুব্ধ মনের ভিতরেও তেমনি শান্ত ভাবের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব। সতীশও তাই বৃন্দাবনে এসে বেশীদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না—সংসার আর অতীতের স্মৃতি তাকে যেন চারিদিক থেকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে টান দিতে লাগ্‌ল।

সতীশ মনে মনে ভাব্‌লে, গুরুদেব বলেন জগৎ মায়াময়—মিথ্যা! আমার কিন্তু গুরুবাক্যে বড়ই সন্দেহ হচ্চে, কারণ যে সত্যকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে নিশিদিন সত্য ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এত সহজে কি-ক'রে তাকে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেব!

গুরুদেবের হুকুম মেনে সে যে পাগলের মতন হিমালয়ে ছুটে গিয়ে সত্যসত্যই ক্ষেপে যায়-নি, এই ভেবে সতীশ এখন মনে মনে অনেকটা আরাম বোধ কর্‌লে।

সতীশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এবারে সে কি কর্‌বে? সে কি আবার লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাবে? কিন্তু আত্মানন্দ-বাবাজীর বৈরাগ্যের লেক্‌চার, মুক্তির টিকা-টিপ্পনী, আর লোটা-কম্বল-ত্রিশূলের আস্ফালন স্মরণ হবা-মাত্রই লক্ষ্ণৌয়ের কথা তার মনে থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে গেল।

তারপরে মনে হোলো, জগদীশপুরের কথা। সেখানে তার মা আছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে তাঁর ফিরে-ফিরতি বিয়ে-করার প্রস্তাবটাও। সুতরাং সে ঠাঁইও যথেষ্ট নিরাপদ নয়।

আচ্ছা, কালীগ্রামে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তখনি তার মনে হোলো, কমলার অন্তর্ধানের কথা! ব্যাপারটা যে-ভাবে তার কাণে উঠেছিল, সতীশ তা বিশ্বাস করছিলও বটে—করছিল না-ও বটে! তাই আসল কথাটা জান্‌বার জন্যে মন তার ব্যথা-ভরা আগ্রহে উসখুস্ ক'রে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কমলা-শূন্য কালীগ্রাম এখন যে কেবল সফল দুঃস্বপ্নের মতন, তা নয়;—সেই সঙ্গে গ্রাম্য ঘোঁটে, চাপা হাসি-ব্যঙ্গ-টিট্‌কিরিতে তা যে কতখানি বিষিয়ে উঠেচে, সেটুকু একবার মাত্র কল্পনা ক'রেই সতীশের মনটা যার-পর-নাই নেতিয়ে পড়্‌ল।

সতীশ ভাবলে, এ কি মুস্কিলেই ঠেকা গেল! সন্নাসী হ'তে বা ঘরে ফিরতে বা নিষ্কর্ম্মার মতন এখানে ব'সে থাকৃতে—আমি এ তিনটের কোনটাই পারচি না! তবে আমি করব কি?

ভেবে-ভেবে সতীশ আর ভাব্‌তে পার্‌লে না—মাথাটা তার ঘুলিয়ে এল! শেষটা সে আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল—"দূর হোক্-গে ছাই,—চুলোয় যাক্ এ-সব ভাব্‌না-চিন্তা! পরের কথা পরে ভাবা যাবে-অখন, আপাতত যখন স্থির করেচি যে সন্ন্যাস নিয়ে আর পাগ্‌লামি করা হবে না, তখন যে ক'টা দিন ছুটি আছে, পশ্চিমের দেশগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখে-নি।"

সতীশ ঠিক করলে, কাল সকালের গাড়ীতেই সে আগ্রায় তাজমহল দেখ্‌তে যাবে।

... ...

কবি সাজাহানের অমর মর্ম্মর-কাব্য নানান লোকে নানান

ভাবে দেখেছে। কিন্তু তাজমহল দেখে সতীশের মনে হোলো, এ যেন তারই প্রিয়তমার মূর্ত্তি!

প্রিয়তমা! কে সে? ······কমলা?—না, সে এ-কমলা নয়—যে-কমলা তার স্নেহপ্রেম, যত্ন-আদর ভুলে, লোক-সমাজে তাকে হাস্যাস্পদ ক'রে, তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে এ-জন্মের মত তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, তার কথা সে আর ভাবতে পারে না ভাবতে চায়ও না! কিন্তু স্বদেশে-বিদেশে যে প্রেমময়ী নারী-মূর্ত্তিকে নিয়ে সতীশের বহু বিনিদ্র-রজনী পরার স্বপ্নের মতন অজান্তে কেটে গেছে, যার চোখের মাধুরী, ঠোঁটের হাসি, তনুর লীলা, হাতের স্পর্শ—সবার উপরে যার বুক-ভরা অগাধ ভালোবাসার স্মৃতি ফুলের মতন তার জীবন-বৃন্তকে পুষ্পিত ক'রে রয়েছে—সতীশ এত সহজে এখনো তাকে ভুলতে পারে-নি—এই পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তাই তো তার বৈরাগ্যের শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টাটা একেবারে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল! সতীশের মনে হোতো, যেন কালকের কমলা আর আজকের কমলা—এ দুজনে এক লোক নয়। যদিও এ-রকম মনে হওয়াটাও ছেলেমানুষী এবং এর কোন-একটা সঙ্গত কারণও নেই, তবু এমনি-একটা ভাবই তার মনের আশপাশ দিয়ে যখন-তখন উঁকিঝুঁকি মারত। যুক্তি-তর্ক এখানে খাটত না—তার মন জোর ক'রে ব'লে উঠত—সে-কমলা এ-কমলা এক লোক নয়, দুজনে স্বর্গ-নরক তফাৎ! সে ছিল আমার, একান্তই আমার, আর এ হচ্ছে······

—এইখানে ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যেত। আজ্‌কের এই কম-ধাকে তার মন নিজের ব'লে দাবি কর্‌তেও পারত না, পরের ব'লে মান্‌তেও রাজি হোতো না—এইখানে মস্ত-বড় একটা অন্ধকার—অজানা অন্ধকার ছিল, সে অন্ধকার যেন লুকানো অশ্রুজলে জমাট্‌!

একদিন, দুদিন তিনদিন—আরো ক'টা দিন একে একে কেটে গেল, সতীশ কিন্তু তাজমহলকে ছেড়ে চ'লে যেতে পার্‌লে না। কি এক অজানা মোহের টানে রোজ সে তাজমহলের দিকে ছুটে আস্‌ত, মর্ম্মরের শুভ্রস্বপ্নের সেই স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শের মধ্যে আপনার ব্যথিত দেহকে এলিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে সে প'ড়ে থাকত, আর তার সাম্‌নে দিয়ে যমুনার কালো জল কলবেদনায় উচ্ছ্‌সিত হয়ে কুল কুল ক'রে বয়ে যেত,—কূলে কূলে মাথা কুটে, রবি-শশীর নয়ন-কিরণে আকুল হয়ে।

সাজাহানের প্রেমের স্মৃতি তাজমহল আজ তারও বুকের ভাঙা-ঘরে প্রেমের দীপশিখাটি আবার যেন উস্কে দিলে—এ মর্ম্মর যেন জীবন্ত, এ পাষাণের মৌন ভাষা যেন কাণ পেতে শোনা যায়, এর এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা যেন বুকের আঁধারকে আলো ক'রে দেয়!

সতীশ স্থির কব্‌লে, কি হবে ছন্নছাড়ার মতন দেশে দেশে ঘুরে ম'রে—ছুটির ক'টা দিন এইখানে বসে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌, দেখি, এতে তবু মনটা কিছু শান্ত হয় কিনা!

... ...

পূর্ণিমার চাঁদের আল্‌পনা সেদিন তাজের মর্ম্মর-শিলায় এসে

ঘুমিয়ে পড়েছিল। চাতালের উপরে গায়ের জামাটা খুলে বালিসে পরিণত ক'রে সতীশও শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছিল—জোছনা আর তাজ যেন আজ মিলে-মিশে ধীরে ধীরে একাকার হয়ে যাচ্ছে—একটু পরেই যেন কে জোছ্‌না, কে তাজ তা আর মোটেই চেনা যাবে না!

হঠাৎ কাছেই কার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল—নিশীথিনীর নীরবতায় সুরের লহরী তুলে। এক তানেই বোঝা গেল, এ যার-তার বাঁশী নয়, ওস্তাদের বাঁশী!

বাঁশী বাজতে লাগল—কিন্তু কি উদাস তার সুর! এ যেন মুখের ফুঁয়ে বাজ্‌চে না—বুকের দীর্ঘশ্বাসে বাজ্‌চে! বাঁশী যেন কবে কাকে হারিয়েছে, আকাশে বাতাসে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, চাঁদের আলোয়, তাজের ছায়ায়, সে যেন কাকে দিশেহারা হয়ে ডেকে-ডেকে কেঁদে ফির্‌ছে—সে কান্না শুনে সাজাহানের আত্মাও যেন কত-যুগের নিশ্চিন্ত সমাধি-শয়ন থেকে জেগে, এখনি উঠে বসে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখ্‌বে, এতকালের পর পাশ থেকে রূপের পুতলি মম্‌তাজ আবার তাকে ফাঁকি দিয়ে হারিয়ে গেছে কি না?

বাঁশীর কান্না থেমে গেল। তার হতাশ সুরে সতীশের চোখের পাতাও ভিজে এসেছিল. একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সে উঠে বস্‌ল—তার আগ্রহ হোলো-বাঁশীর এই ওস্তাদটিকে একবার দেখ্‌বার জন্যে।

দেখ্‌লে, কাছেই, যমুনার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটি লোক চুপ ক'রে বসে আছে। পোষাক দেখে বুঝা গেল, বাঙালী।

সতীশ স’রে তার কাছে গিয়ে ব’সে বললে, “দয়া ক’রে আর একবার বাজাবেন কি ?”

লোকটি সতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখলে। তারপর একটু হেসে, কোন কথা না ক’য়ে বাঁশীতে আবার ফুঁ দিলে।

সেবারেও বাঁশীতে নিরাশার আর এক রাগিণী বেজে উঠল। এ বাঁশী যেন কান্না বৈ আর কিছু জানে না।

কেঁদে কেঁদে বাঁশী আবার থামল। সতীশ আর সেই লোকটি, দুজনেই আনমনে নীরবে অনেকক্ষণ পাশাপাশি ব’সে রইল।

তারপর সতীশ ধীরে ধীরে বললে, “আপনার বাঁশীর ভেতরে আরো কত কান্না পোরা আছে ?”

লোকটা তেমনি মৃদু-মৃদু হেসে বললে, “আপনার মন রাখবার জন্যে আমার বাঁশী হাসতেও পারে! শুনবেন ?” সে ফের বাঁশীটিকে মুখের কাছে তুললে।

সতীশ বাধা দিয়ে বললে, “না, তাজের কোলে হাসি তো জমবে না! এ তাজ যে বিরহীর চোখের অশ্রু দিয়ে গড়া!”

লোকটি বললে, “তাইতো আমারও বাঁশীর মুখে হাসি আসে নি। এই দুঃখের দুনিয়ার সঙ্গে কান্নার সুর ছাড়া আর-কিছু তো খাপও খায় না!”

তার কথাবার্তা শুনে, লোকটিকে সতীশের বড় ভালো লাগল। সে বললে, “যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনার পরিচয়টি জানতে পারি কি ?”

—"ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। কপিলডাঙায় থাকি। মশায়ের পরিচয়?"

—"সতীশচন্দ্র রায়। নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়, জগদীশপুরে।"

ক্ষিতীশের হাত থেকে বাঁশীটি খসে সশব্দে পড়ে গেল। অত্যন্ত বিস্ময়ে সে সতীশের মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

—"আ-হা-হা, দেখুন, বাঁশীটা ভেঙে গেল না তো?" এই ব'লে সতীশ বাঁশীটা তুলে নিয়ে ক্ষিতীশের অসাড় হাতে ফের গুঁজে দিলে।

ক্ষিতীশ ততক্ষণে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "জগদীশপুরে সতীশচন্দ্র রায় ব'লে আর কেউ থাকেন নাকি?"

—"না। তবে আমি যেখানে চাকরী করি, সেই লক্ষ্ণৌয়ে আমার নামে আর একজন আছেন।"

ক্ষিতীশের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সে বল্‌লে, "কালীগ্রামে কি আপনার শ্বশুরবাড়ী?"

ভুরু কুঁচ্‌কে সন্দিগ্ধ স্বরে সতীশ বল্‌লে, "হ্যাঁ। কিন্তু এ-কথা আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?"

ক্ষিতীশ অত্যন্ত খুসি হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "সতীশ বাবু, আপনার কথার জবাব পরে দেব। আপাতত ভগবানের দয়ায় এমন আশ্চর্য্য ভাবে যখন আপনার দেখা পেয়েছি, তখন আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। খুব কাছেই আমার বাসা। আপনাকে এখনি সেখানে যেতে হবে।"

ক্ষিতীশের দিকে হতভম্বের মতন খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সতীশ বল্‌লে, "আমাকে যেতে হবে আপনার বাসায়? কেন মশাই?"

—"আপনার 'কেন'র জবাব আমার বাসায় গেলেই পাবেন।"

—"আপনি কে?"

—"মণিহারা ফণি।"

—"আপনার কথার অর্থ?"

—"ক্রমশ-প্রকাশ্য। এখন উঠুন—উঠুন, আর দেরি কর্‌বেন না!"

এই ব'লে ক্ষিতীশ অবাক সতীশকে দু'হাত ধ'রে একরকম জোর ক'রেই টেনে-হিঁচ্‌ড়ে-তুলে নিয়ে গেল। তার অত সাধের দামী বাঁশীটা যে তাজের আলো-মাখা সাদা চাতালে কালো একটা রেখার টানের মতন পড়ে রইল, আনন্দের আবেগে সেদিকে তার একটুও খেয়াল রইল না।

২৪

গেল-দুদিন হরনাথ মৈত্রকে ভিন্‌-গাঁয়ের এক যজমানের বাড়ীতে, কি-একটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাক্‌তে হয়েছিল। যজমানবাড়ীর কাজ-কর্ম্ম সেরে, আজ দুপুরে তিনি আবার নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আস্‌ছিল দুটো লোক। তাদের মাথায় বড় বড় দুটো বস্তা এবং একটা বস্তার ফাঁক দিয়ে একটি নতুন চক্‌চকে পিতলের ঘড়া উঁকি

মারচে। দেখলেই বুঝে নিতে দেরি হয় না যে, যজমানের বাড়ী থেকে এবারে ঠাকুরের যা লাভ হয়েচে, তা যৎসামান্য নয়।

রোদ্দুরের ঝাঁজ থেকে রেহাই পাবার জন্যে হরনাথ মাথার উপরে ভিজে গামছাখানি পাট ক'রে রেখে, একটি সাদা কাপড়ে মোড়া ছাতার ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি বাড়ার দিকে ফিরছিলেন। তাঁর বাঁ-হাতে যজমানের দেওয়া খানকয়েক নতুন কাপড়।

এই ক'দিনেই হরনাথের চেহারা কেমন বুড়িয়ে পড়েচে,—দেহটিও রোগা, কোলকুঁজো হয়ে গেছে। তাঁর চোখছুটি বসা-বসা, তার তলায় গভার কালির রেখা। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বুকের ভিতরে তিনি অহরহ কি অসহ চিতার দাহ সহ্য করচেন!

যজমানী করতে তাঁর মনে আর একটুও ইচ্ছা নেই—কাজকর্ম্ম এখন যা করেন তা কতকটা শিষ্যদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দায়ে ঠেকেও বটে, আর কতকটা আপনার ব্যথিত প্রাণকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যেও বটে!

চারিদিকে কাঠফাটা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করচে—পায়ের তলায় পথের ধূলোগুলো পুড়ে পুড়ে যেন আগুনের কণা হয়ে উঠেচে। হরনাথ কোনদিকেই না-তাকিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলছিলেন—হঠাৎ ডানদিক থেকে শব্দ উঠল—'কিস্তি মাৎ!' হরনাথ বুঝলেন, শশী মুখুয্যের ঘরের দাওয়ায় তাসদাবার

দৈনিক আসরটা রীতিমত জমে উঠেচে। তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে ছাতাটাকে ডানধারে হেলিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা কর্‌লেন। কমলার অন্তর্ধানের পরে এই শশী মুখুয্যেকে তিনি ভালো ক'রেই চিনে নিয়েছিলেন। তাই তার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গভরা মুখে বিনয়প্রকাশের মহা-আড়ম্বর দেখ্‌লেই, হরনাথের বুকের ভিতরে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে লাগ্‌ত।

কিন্তু 'কাণা শশী'র একটিমাত্র যে চোখ, তা সাপের মতন তীক্ষ্ণ। সে চিলের মতন চিঁচিঁ-করা গলা তুলে সাড়া দিলে—"হরনাথ-দা, বলি ও হরনাথ-দা! অধীনদের দিকে একটি-বার নেক্‌-নজরে চেয়ে যান, এমন ক'রে পায়ে ঠেলে গেলে তো চল্‌বে না!"

হরনাথ বেগতিক বুঝে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। ছাতার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে অপ্রভিত স্বরে বল্‌লেন, "না ভাই, রোদ্দ্‌রের ঝাঁজে অনেকখানি পথ হেঁটে তেষ্টায় প্রাণটা টা-টা করচে—এখন কি আর কোনদিকে চাইবার যো আছে? তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে পার্‌লেই বাঁচি!"

কাণা শশী বকের মতন এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লে, "সে কি দাদা, তেষ্টা পেয়েচে? আসুন—আসুন, আমার বাড়ীতে আসুন!"

হরনাথ বল্‌লেন, "আর ভায়া, বাড়ীর কাছেই এসে তো পড়েচি, একেবারে স্নানাহ্নিক ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে জল্‌-টল্‌ যা-হয় খাওয়া যাবে!" এই ব'লে তিনি আবার এগিয়ে পড়বার চেষ্টা কর্‌লেন।

শশী আঁকুপাকু ক'রে বল্‌লে, "দাদা যাবেন না! জল না খান, একটা সুখবর অন্তত শুনে যান।"

হরনাথ নিরাশ ভাবে করুণ স্বরে বল্‌লেন, "সুখবরের কথা আর তুলো না ভায়া, এ-জীবনে সু আর কু, ও দুইই এখন আমার কাছে এক কথা।"

শশী 'হাঁ'য়ের অন্ধকারে অনেকগুলো হল্‌দে দাঁতের ঝিলিক্‌ মেরে একগাল হেসে বল্‌লে, "হরনাথ-দা', অতটা হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌বেন না! সত্যিই যদি সুখবর দি, আমাকে কি খাওয়াবেন বলুন দেখি?"

শশীর রকম-সকম দেখে হরনাথের মনে সাঁ-ক'রে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। শশী তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়—অকস্মাৎ তার এতটা আত্মীয়তার কারণ কি? উদ্বিগ্নভাবে তিনি বল্‌লেন, "শশী, তুমি কি বল্‌চ? তোমরা কি কমলার কোন খবর পেয়েচ? এতদিন যা কামনা কর্‌ছিলুম, তাই কি হয়েচে? সত্যিই কি কম্‌লী মরেচে? বল, বল—এর চেয়ে সুখবর এখন আমার কাছে আর কিছুই নেই।"

শশী নকল দরদে মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচু-মাচু ক'রে বল্‌লে, "ওকি কথা হরনাথ-দা? বাপ হয়ে মেয়ের মৃত্যু-কামনা করবেন না, ছি!"

হরনাথের সন্দেহ বেড়ে উঠ্‌ল। তিনি উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্‌লেন, "শশী, তুমি যা বল্‌তে চাও, শীগ্‌গির ব'লে ফেল!"

শশী তার হাসিকে আরেকটু মিষ্টি ক'রে বল্‌লে, "অরুণ যে কমলাকে নিয়ে কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসেচে!"

হরনাথের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন দমাস্‌ ক'রে ফেটে যাবার মতন হ'ল, দু-হাতে বুকখানা জোরে চেপে ধ'রে বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর চোখের সাম্‌নে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সমুজ্জ্বল শিখাও যেন এক-মুহূর্ত্তে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আধ-মরা ইঁদুরের ভাবভঙ্গি বিড়াল যেমন নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে দেখে, হরনাথের দিকে শশী ঠিক তেম্‌নি ভাবেই বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে পর, বিষম রাগে আর অপমানে হরনাথের সমস্ত মুখখানা রাঙা টকটকে হয়ে, রগের উপরকার শিরগুলো ঠেলে ঠেলে ফুলে উঠ্‌ল। ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আগুন-ভরা চোখে শশীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "ওরে মহাপাপী, এই কি তোর সুখবর? তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক্‌, বজ্রাঘাত হোক্‌!" বল্‌তে বল্‌তে একরকম ছুটেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। খানিকদূর গিয়ে শুন্‌লেন, শশীর আড্ডা থেকে অনেকগুলো গলা একসঙ্গে হো-হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

বাস্তবিক, এতক্ষণ শশীর দলের লোকগুলি চরম আগ্রহের সঙ্গে যেন অত্যন্ত উত্তেজক একখানা নাটকের বিচিত্র অভিনয় দর্শন কর্‌ছিল। হরনাথ চলে গেলে পর খুব একচোট হেসে

নিয়ে বোসজা বল্‌লেন, “টাকার গরমে মৈত্রের পা যেন এতদিন মাটির ওপরে পড়্‌ত না! কিন্তু মাথার ওপরে যে দর্পহারী মধুসূদন হাস্‌চেন, সে খোঁজ তো শর্ম্মা রাখ্‌তেন না! আচ্ছা শশী, মৈত্র এখন কি করবে বল দেখি? কম্‌লী ছুঁড়ীকে বাড়ীতে রাখ্‌বে, না ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দেবে?”

হরনাথের সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখে আর অভিশাপ শুনে, শশীর পাপী মনটা দস্তুরমতন চম্‌কে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে এখন সে ভাবটা সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে, “বোধ হয় তাড়িয়েই দেবে। কিন্তু বলাও যায় না, মৈত্র যেমন চট্‌ ক'রে রেগে ওঠে, তেম্‌নি শীগ্‌গির তার রাগ জল হয়েও যায়। আর হাজার হোক্‌ বাপের মন, মেয়েব মুখ দেখে ভুলে যেতেও কতক্ষণ?—যা-হোক আপাতত তোমরা এখানে বোসো তো, এর-মধ্যে আমি জমিদার-বাবুকে খবরটা দিয়ে আসি।”

একজন জিজ্ঞাসা করলে, “গিয়ে কি বল্‌বে?”

—“বলব যে হরনাথ মৈত্র ফিসে এসেচে। কম্‌লীর আসার খবর জমিদার-বাবুর কাণে আগেই উঠেচে। কেবল মৈত্র এখানে ছিল না ব'লেই এ দুদিন তিনি রাগ সাম্‌লে চুপ ক'রে আছেন!”

সকলকার মুখেই ভারি-একটা আরাম ও সন্তোষের লক্ষণ ফুটে উঠ্‌ল! গাঁয়ে দিন-কে-দিন হরনাথের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যে-লোকগুলি মনের ভিতরে বরাবর নিষ্ফল হিংসা আর

আক্রোশ পুষে আস্‌ছিলেন, আজ তাঁদের অন্তর্দাহ নিবারণের মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত!

২৫

হরনাথ যখন প্রচণ্ড একটা উল্কার শিখার মতন বাড়ীর ভিতরে এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুক্‌লেন, মৈত্র-গিন্নি তখন অরুণ আর কমলার সাম্‌নে ভাতের থালাখানি পাঁচরকম অন্নব্যঞ্জনে সাজিয়ে এনে ধর্‌ছিলেন।

হরনাথকে প্রথমেই দেখ্‌তে পেলে কমলা! সে তখনি পিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে, "বাবা গো" ব'লে কেঁদে ছুটে এসে, দু-হাতে হরনাথের পা-দুখানা একসঙ্গে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে।

মৈত্রগিন্নিও দুঃখের আনন্দে কেঁদে ফেলে বল্‌লেন, "ওগো তোমার কম্‌লীকে ঠাকুর আবার ফিরিয়ে দিয়েচেন গো!"

হরনাথ একবার কমলা, আর একবার গৃহিণীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর সে দৃষ্টি পাগলের মতন উদ্‌ভ্রান্ত। তারপর অরুণের দিকে চেয়ে তিনি গর্জ্জন ক'রে ডাক্‌লেন—"অরুণ!"

তাঁর সেই কড়া ডাকে ভয় পেয়ে অরুণ খুব আস্তে সাড়া দিলে, "বাবা!"

মৈত্রগিন্নি স্বামীর ভাব দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণে দেব-দেবীকে স্মরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। হরনাথ মৈত্রের রাগ এ গ্রামে ঘরে ঘরে বিখ্যাত। রাগের মাথায় তিনি অনেক সময়ে এমন-সব কাজ ক'রে ফেলেচেন, যে-জন্যে পরে তাঁকে অনুতাপ কর্‌তে হয়েচে।

হরনাথ কর্কশ স্বরে বল্লেন, "অরুণ, কম্লীকে তুই কোথায় পেলি ?"

অরুণ মৃদুস্বরে বল্লে, "ক্ষিতীশ বাবুর বাসায়।"

হরনাথ চোখ পাকিয়ে বল্লেন, "ক্ষিতীশ! কে ক্ষিতীশ ?"

বাপের সঙ্গে কথা কইতে অরুণের ভরসায় আর কুলোলো না। অত্যন্ত দীনভাবে করুণ চোখে সে মায়ের দিকে তাকালো।

মৈত্র-গিন্নি স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে বল্লেন, "ওগো, সে অনেক কথা। কম্লী আর অরুণের মুখে সমস্তই আমি শুনেচি। শোনো—"

হরনাথ ধম্কে বল্লেন, "গিন্নি, তুমি থামো! ওদের যে-কথা তুমি বিশ্বাস করেচ, গাঁয়ের আর-পাঁচজনেও তোমার মতন অত সহজে তা বিশ্বাস কর্বে না!"

—"বিশ্বাস কর্বে না! কেন ?"

—"কেন, তাও আবার খুলে বল্তে হবে? কারণ, তোমার মেয়েকে তোরা কুলটা বলে!"

এতক্ষণ কমলা ভূলুণ্ঠিত দেবী-প্রতিমার মতন হরনাথের পায়ের তলায় পড়ে চোখের জলে ধরিত্রীর ধুলোকে সিক্ত ক'রে তুল্ছিল। এখন সে আহত ফণিনীর মতন আচম্বিতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাবা, বাবা! তুমিও কি আমাকে তাই ব'লে বিশ্বাস কর ?"

হরনাথ গম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র বল্লেন, "হুঁ।"

কমলার দুইচোখে যেন বিদ্যুতের হল্‌কা ঝল্‌কে উঠ্‌ল। সগর্ব্বে মাথা তুলে তীব্র স্বরে সে বল্‌লে, "তুমিও? তুমি,—আমার বাবা, তুমিও বিশ্বাস কর?"

হরনাথ কমলার সেই অভাবিত, তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু সে বিস্ময় তাঁকে একটুও টলাতে পার্‌লে না। সেদিনের সেই নিদারুণ কথা আজও তাঁর বুকের পরতে পরতে গাঁথা আছে—যেদিন কল্‌কাতায় হরেনের মেসে গিয়ে ক্ষুদিরামের মুখে তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন যে, হরেনের সঙ্গে কমলা একলাটি বোম্বাই মেলে বিদেশে চ'লে গিয়েচে। তারপর,—এই ক্ষিতীশ! কোথাকার কে সে? তার বাসায় কমলা কেন ছিল? এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে? তিনি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ, আমিও বিশ্বাস করি, যা নিজে গিয়ে জেনে এসেচি, তা বিশ্বাস না-করাই আশ্চর্য্য। এতদিন পরে কেন তুই আবার এখানে ফিরে এলি, কেন তুই মরতে পারলি না, কেন তুই—"

দুইহাতে দুইকাণ ঢেকে, চক্ষু মুদে, গভীর বেদনায় অবরুদ্ধ স্বরে কমলা ব'লে উঠ্‌ল—"আর শুনতে পারিনি গো—বাবা, থামো, থামো,—যথেষ্ট হয়েচে!......ভগবান, তোমার জগতে নারী এত অসহায়! উঃ!" কমলা ট'লে পড়ে যাচ্ছিল—মৈত্র-গিন্নি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেল্‌লেন।

হরনাথ কমলার সে অবস্থা দেখেও দেখ্‌লেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, অবিচল স্বরে তিনি বল্‌লেন, "আমার ঘরে

কলঙ্কিনীর ঠাঁই নেই'! এখানে আর এক-দণ্ড না! চ'লে যা চ'লে যা—এখনি চ'লে যা—নইলে—"

মৈত্র-গিন্নি কান্নাভরা গলায় ব'লে উঠলেন, "ওগো, তুমি কি পাষাণ গো! অমন কথা মুখেও এনো না!"

হরনাথ তেম্‌নি অটল ভাবেই তিক্ত স্বরে বল্‌লেন, "গিন্নি, যে দোষে যোগেন মিত্তির তাঁর ছেলের মায়াও ছেড়েচেন, সেই একই দোষে দোষী এই পাপিষ্ঠাকে কোন্ মুখে আমি ঘরে তুলে নেব?"

—"হ্যাঁ গা, যোগেন মিত্তির ছেড়েচেন ব'লে সমাজও তো হরেনকে ঠেলে রাখ্‌বে না। সে ব্যাটাছেলে আর কমলা যে মেয়ে! এ বিপদে তুমি না দেখ্‌লে তাকে যে আর কেউ দেখ্‌বে না!"

হরনাথ অত্যন্ত শুক্‌নো একটা হাসি হেসে বল্‌লেন, "এক জন দেখ্‌বে—তার নাম যম। আমার রক্তের একবিন্দুও যদি কম্‌লীর দেহে থাকে, তবে ও যেন এখনি গিয়ে তারই আশ্রয় নেয়!" বল্‌তে বল্‌তে হরনাথের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে, তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তের সেই একান্ত অস্বাভাবিক হাসিকে ভিজিয়ে দিলে।

কমলা হঠাৎ মায়ের আলিঙ্গন থেকে আপনাকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিলে। বাপের মুখের দিকে শান্ত চোখ তুলে স্থির ভাবে বল্‌লে, "বেশ বাবা, তাই হবে। তোমরা সকলে মিলে যা-থেকে আমাকে বিনাদোষে বঞ্চিত করলে, দেখি যমের কাছে

গিয়ে সত্যিই সে আশ্রয় পাই কিনা !” তার পর ফিরে পূর্ণদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লে, “মা, তোমার জামাইয়ের খোঁজ যদি পাও, তবে তাঁকে আমার এই শেষ-নিবেদন জানিও যে, কলঙ্কিনী নাম নিয়ে মর্‌লেও আমার স্বামী-ভক্তি কোন দিন সাবিত্রীর চেয়ে একটুও কম ছিল না।” বল্‌তে বল্‌তে তার গলার আওয়াজ ধরা-ধরা হয়ে উঠ্‌ল, চোখের পাতা আবার কান্নার জলে ভেরে এল—কিন্তু প্রাণপণে প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস দমন ক’রে, মায়ের সমস্ত বাধা এড়িয়ে সে দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল—তার পরেই, আবার কি-যেন দেখে চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আশ্চর্য্য ক’রে হরেন এসে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে কমলার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, “বোন, এমন যে হবে, আমি তা আগেই জান্‌তুম। তাই তোমাকে বিদায় দিয়ে কলকাতায় আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি নি। তোমার খোঁজে আমি জগদাশপুর গিয়েছিলুম, সেখান থেকে সব শুনে একেবারে এখানে ছুটে এসেচি।”

হরনাথ প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস কর্‌তে পারলেন না। হরেন যে ভরসা ক’রে তাঁর বাড়ীতে মাথা গলাতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে, পথ হেঁটে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর ভগ্ন দেহ একে তো অবশ হয়ে ছিল, তার উপরে এই-সব বিষম উত্তেজনা ও নানা ভাবাবেগের ঘাত-প্রতি-ঘাত! এখন এই শেষ-ধাক্কায় একেবারে ভেঙে প’ড়ে হাঁপাতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

New Artistic Press, Calcutta.

হাঁপাতে তিনি বল্‌লেন, "না, আর পারি না! মধুসূদন, এ অগ্নি-পরীক্ষা থেকে আমাকে রেহাই দাও প্রভু!" এই ব'লে তিনি ধুপ ক'রে মাটির উপরে ব'সে প'ড়ে, দুইহাঁটুর মাঝখানে নিজের মুখ ঢেকে ফেল্‌লেন।

ঠিক সেই সময় বাড়ীর বাহির থেকে গম্ভীর গলায় কে ডাক্‌লে, "মৈত্র-মশাই বাড়ীতে আছেন কি?"

হরনাথ পাথরের নিশ্চল মূর্ত্তির মতন ব'সে রইলেন—সাড়া-শব্দ কিছুই দিলেন না।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আমার বাবা ডাক্‌চেন?"

২৬

ক্ষিতীশের বাসা থেকে সতীশ বেরিয়ে এসে যখন পথের মধ্যে দাঁড়াল, তখন রাত অনেক হয়েছে। জন-মানবহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে তার জোট-খাওয়া চিন্তা-সূত্রের খেই খোঁজ্‌বার অবসরটুকু যেন তাকে নিমেষে সঞ্জীবিত করে তুল্‌লে।

তাজের গম্বুজের উপর চাঁদের আলোর শুভ্র হাসিটি যেন একশ' বার করে তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, পৃথিবীর কোন জিনিষই অবহেলার নয়! মানুষ নিজের হীনতার ছাপ দিয়ে তাকে কালো করে দেখে—অযথা স'রে দাঁড়াতে চায়।

কমলার কথা মনে করে তার মনের একদিক যেমন আনন্দে স্বস্তিতে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—অপর দিক্‌টা তেম্‌নি কুণ্ঠায় গ্লানিতে

ক্ষুব্ধ আহত হয়ে পড়ল। তার মার অনুজ্ঞা মনে পড়ল,—ঠিক কথাই শাস্ত্রে বলে—হাজার অশিক্ষিত নিরক্ষর হন, তবুও মা মা-ই!—তিনি ত আগা-গোড়াই বলে এসেচেন, বেনামি উড়ো চিঠি বিশ্বাস করা তার কত বড় আহাম্মকি হয়েছে!

বাসায় যেতে মন চাইলে না। সে আস্তে আস্তে ফিরে ক্ষিতীশের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেইখানটিতে গিয়ে আবার বস্‌ল।

কি চমৎকার রাত, কি সুন্দর জায়গা! দূরে যমুনার কালো জল—সাদা বালির উপর মৌন জ্যোৎস্না—যেন তারই মত জেগে বসে আছে। মাথার উপর দিয়ে একটা পেঁচা চীৎকার করে উড়ে গেল। তার শব্দের রেশটা আকাশে মিলিয়ে গেল—কিন্তু গম্বুজের ভিতরটা অনেকক্ষণ যেন গুম্‌রতে লাগ্‌ল।

সতীশ ভাব্‌লে—তাইত, এই পেঁচাটার ত কিছুই ভালো লাগে না। এত আলো, এত শোভা থেকে কেন সে এমন ভাবে বঞ্চিত! আচ্ছা, সে নিজে বঞ্চিত, না আর কারুর ইচ্ছায় বঞ্চিত? কি জানি,—হয়ত, কেউই জানে না,—যে যা বলে, সব নিজের মনগড়া কথাই বলে, বোধ হয়!

আবার সে ফিরে-ফিরতি নিজের কথাই ভাব্‌তে বস্‌ল।

অসুখ শুনে কমলা অধীর হয়ে সব ভয়-ভাবনা নিন্দা-গঞ্জনাকে তুচ্ছ করে ছুটে গেছে তার মার সেবা করতে। আর সে? কাপুরুষ কুপুত্র।

সতীশের চোখের সাম্‌নে কমলার ছবিখানি পরিস্ফুট

সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠ্‌ল ! রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে পতিগত-প্রাণা তার সতী সাধ্বী স্ত্রী কমলা ; অনাহারে অনিদ্রায় ক্ষীণতনু—এই ত' সংসার, এই ত' সর্গ ! তাই মানুষের মন কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে চায় না ; যেতে পারেও না ।

গভীর প্রেম-প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে' চোখ দুটিও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হলো। তার মনে হলো—তার এখন একান্ত কর্ত্তব্য হচ্চে অচিরে গিয়ে কমলাকে সাহায্য করা। নিমেষে আবার মনে মনে কমলার কাছে নিজেকে সে নিয়ে গেল। কমলার কোমল দুখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেন বল্‌চে—কমলা, তোমাকে কি আমি সন্দেহ করতে পারি !

এমন সময় পিছন থেকে' পাহারাওয়ালা উচ্চ স্বরে হাঁকৃলে—কোন্ হ্যায় ?

সতীশ তাকে তার অক্ষম দুর্ব্বল হিন্দিতে বুঝিয়ে দিল যে সে একজন—মুসাফির ।

প্রহরী বল্লে—বাবুজি ; বাঁন্‌শি ভি বজাতে হেঁ ? সতীশ চেয়ে দেখ্‌লে, ক্ষিতীশের বাঁশিটি পড়ে রয়েচে। সেটাকে হাতে তুলে নিতেই—চৌকিদার একটু বক্র হাসি হেসে অন্যদিকে চলে গেল। তার হাসির অর্থ আর কিছুই নয়—দুনিয়াতে কত পাগলই আছে !

বাঁশিটা আগা-গোড়া নিরীক্ষণ করে সতীশ মনে মনে ভাব্‌লে—এই একই জিনিষ, কিন্তু আমার ফুঁতে এটা' কি কুৎসিত শব্দই

না করবে!; বাস্তবিক কি শুভক্ষণেই বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! আমার কমলাকে উনি বাঁচিয়েছেন—আমাকে আমার জিনিষ পৌঁছে দেবার জন্যে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছুটে ছিলেন। কপাল আমার!

কমলার জন্য হঠাৎ তার মনটা কেমন অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল! মনে হলো কাজ নেই আর দেরী করে—কি জানি, কি হতে কি হয়—আজকের শেষ-রাত্রের গাড়ীতেই রওনা হয়ে যাই। কিন্তু এই বাঁশিটা কি করে ফিরিয়ে দেব? আচ্ছা, থাক্ না দিন-কতক আমার কাছে। আমিও একদিন তাঁর জিনিষ তাঁকে ফেরাতে যাব, সে বেশ হবে এখন।

পথে বেরিয়ে পড়ে সতীশ হন্‌-হন্‌ করে বাসার দিকে ছুটল। পথের কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করতে লাগ্‌ল। যেটা বড় কাছা-কাছি এসে পড়লো—তাকে বাঁশিটা উচোঁতেই সে পালিয়ে গেল। সে মনে মনে হেসে বল্‌লে, মন্দ কাজে লাগ্‌চেনা এটা। হয়ত আরো কাজে আস্‌বে একদিন।

বাসার দোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ডাকাডাকি করতেই খুলে দিয়ে চাকরটা বল্‌লে, বাবুজি, ভারি রাত হুয়া। তার হাতে একটা কেরাসিনের ডিপে—চোখদুটো সন্ত ঘুম ভাঙ্গাতে তখনো ছোট্ট হয়ে রয়েছে।

সতীশ বল্লে—রঘ্‌ঘু, আভি গাড়ি পাওয়া যায়েগা? অগার আয়ে শকেগা ত বকশিশ দেঁগা।

যো হুকুম—বলে রঘুবীর গাড়ীর উদ্দেশে বার হয়ে গেল।

জিনিষ-পত্র বড় কিছু ছিল না—তবে নেহাৎ ল্যাঙ্গুটা-কম্বলও নয়। কারণ সতীশ কোনদিনই হিমালয়ের গহ্বরে বসে যে ধ্যান-মগ্ন হতে পারবে—এমন আশাও করেনি এবং ততখানি মনের জোরও তার কোন কালে ছিল না।

বাসার ম্যানেজার-বাবুকে আর ডেকে তুলতে হলো না; তিনি একটু সতর্ক ধরণের লোক। পাছে কে কোন্‌দিন চার্জ্জ না দিয়ে স'রে পড়ে, এ ভাবনা তাঁর সর্ব্বদাই লেগে থাক্‌ত। আর সতীশকে তাঁর কেমন-কেমন বোধ হ'ত—যেন খামখেয়ালি—মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই। রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি খবর নিতেন, কে এল-গেল। বাসন-চুরির ভয়ে সন্ধ্যা না হতেই বাসার দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

দোর খুল্‌তেই সতীশ তাঁর সুমুখে পড়ল। তিনি বলে উঠ্‌লেন,—কি মশাই, এত রাত হল যে! তার পরেই সতীশের হাতে বাঁশি দেখে বলে উঠ্‌লেন—আখ্‌ড়ায় গিয়েছিলেন বুঝি?

সতীশ পৈতে-শুদ্ধ চাবিটা তালার মধ্যে পুরে দিতে দিতে বল্লে—না! এই একটু—আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম।

ম্যানেজার বাবু অবাক্ হয়ে সতীশের দিকে চেয়ে রইলেন।—সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকে বাতিটা জ্বেলে ফেলেই তার সংক্ষিপ্ত বিছানা-পত্র টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেলে সব বেঁধে ফেল্‌বার উদ্যোগ করতে লাগ্‌ল।

এদিকে রঘুবীর ফিরে এসে ভারি গলায় বল্লে—বাবুজি গাড়ি নেহি পায়া—একঠো টম্‌টম্ লায়া।

সতীশ অন্যমনস্কভাবে বল্লে—আচ্ছা হো যাগা—উস্‌কো ঠারণে বোলো।

ম্যানেজার বাবুর চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ব্যাপার কি? লোকটা পালাচ্চে না কি? গতিক ত' ভালো নয়, দেখ্‌চি!

রঘুবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে বাবুজির বিলকুল চিজ বিছানার মধ্যে পূরে দিয়ে একটা মস্ত মোট বেঁধে মাথায় করে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল।

সতীশ বার হয়ে এসে বল্লে,—তবে এখন আসি ম্যানেজার বাবু, এই গাড়ীতেই মনে করচি—আমি বাড়ী যাব।

ম্যানেজার বাবুর আর সহ্য হল না—তিনি তখন অতি স্পষ্ট করেই বল্লেন—আপনার চার্জ্জ?

সতীশ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—ইস্ তাইতো—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম মশাই—একটা ভারি—এই অবধি বলেই একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর একটা ঢোক গিলে বল্‌লে,—বাড়ী থেকে মন্দ খপর পেয়েচি কিনা, তাই বাড়ী যাচ্চি—তা আপনি কিছু মনে করবেন না।

ম্যানেজার বাবু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠ্‌লেন—তা হবে না মশাই—টাকা-কড়ি দিয়ে তবে যেতে পাবেন, নইলে—

সতীশের কেমন ধাঁ করে রাগ হয়ে গেল, সে বল্লে—নইলে কি?—আপনি ত' বেজায় ছোটলোক দেখ্‌চি, মশাই!

ম্যানেজার বাবুর একটা মুদ্রা-দোষ ছিল—তিনি রাগলেই এক-

একটা কথার এক-একটা অক্ষর অনেকবার উচ্চারণ করে ফেল্‌তেন। তিনি বল্লেন,—ছো-ছো-ছো-ছো-ছো-টো লোক তু-তু-তু-মি না আ-া-া-া-মি ? টাকা না দিয়ে চ-চ-চ-চ-লে যাচ্চ ?

সতীশ বল্লে—কে—চলে কে যাচ্ছে, মশাই ? টাকা দিতে ভুল হয়ে গেছে—তাই বল্‌চি।

ম্যানেজার তখনি শান্ত হয়ে বল্লেন—তাই বলুন।

—কত দিতে হবে ?

—পাঁচ টাকা সাড়ে বারো আনা।

সতীশ তার হাতে ছটা টাকা দিয়ে বল্লে—খুচ্‌রো বাকিটা রঘুবীরকে দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার বাবু মহা খুসী হয়ে টাকাটা হাতে নিলেন। মনে মনে সতীশের প্রশংসা করলেন—লোকটা দেখ্‌চি খাসা,—বিনা হিসাবে টাকা দেয় !

সতীশ সটান গিয়ে টম্‌টমে চড়ে বল্‌লে,—হাঁক্‌কে যাও। টম্-টম্ গাড়ার মৃতকল্প ঘোড়ার পিঠে কোচম্যান চাবুক কশিয়ে দিয়ে জিভটা গালের মধ্যে পুরে একটা অদ্ভুত রকম শব্দ করলে—যাতে নাকি অশ্বজাতি গমন বিষয়ে একান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে—টম্‌টমের ঘোড়াও অম্‌নি সে শব্দে প্রাণপণ বলে ছুট্‌তে সুরু করে দিলে।

২৭

হরেনের গলার আওয়াজ পেয়ে যোগেন মিত্র আর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর বিস্ময়ের অবধি

রইল না—এবং রাগটা এমন অপরিসীম হলো যে পায়ের হাঁটু ছুটো পর্য্যন্ত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল।

তিনি যখন বাড়ীর উঠানের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে ঠিক মনে হলো যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান প্রলয়। চোখদুটো রাগে বড় এবং লাল হয়ে উঠেচে—কপালের উপর একটা শিরা ফুলে ধক্ ধক্ করচে;—কাঁচা-পাকা গোঁফ-জোড়াও ফুলে দেড়া হয়েচে।

যোগেন মিত্র চাৎকার করে বল্লেন—পাজি, ছুঁচো, শূয়ার, হতভাগা, নচ্ছার—তুই এখানে কি করচিস্?

তার বাপের রাগ যে কি তুমুল, হরেন তা জান্‌ত, আর এও সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে একদিন তার ভীষণ ধাক্কা তাকে পোয়াতেই হবে। তাই সে কোন কথার উত্তর না দিয়ে একটু আড়ভাবে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে যে কতখানি নিজেকে সাম্‌লাচ্চে—তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার পকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হাত দুখানার ধরণ দেখে—মনে হচ্ছিল, বগলের নীচে থেকে তার কোট-টা বুঝি বা নেমেই আসে!

পুত্রকে নির্ব্বাক দেখে মিত্রজা কিছুমাত্র শান্ত হলেন না—বরং রাগের মাত্রা তাঁর আরো চড়ে গেল। তিনি হরনাথের দিকে ফিরে বল্লেন,—এই রাস্কেলকে তোমার অন্দর মহলের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছ কেন?—ওকে জুতো মেরে রাস্তায় বার করে দাও—এক তিলও দেরী করো না,—দাও।

হরেন বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে অকম্পিত স্বরে বল্লে—পরের বাড়ীতে ঢোকা যদি দোষ হয় ত' আমি একা দোষী নই।

ঠিক এমনভাবে কথার উত্তর শোনা জমিদার বাবুর মোটেই অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি পুত্রের ঔদ্ধত্যে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। আর একটা কথা তাঁর মনে এলো যে পুত্রের কাছে এমনভাবে অপমানিত না হবার উপায় তাঁর হাতেই ছিল।

এমন সময় কমলা ডাকলে,—জেঠামশায়! যোগেন একবার তার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে তাড়াতাড়ি এমন করে মুখ সরিয়ে নিলেন যাতে প্রকাশ হলো যে এই কুলত্যাগিনীর সঙ্গে কথা কওয়াও উচিত নয়—এইটেই তাঁর দৃঢ় এবং স্থির মত।

কিন্তু কমলা উত্তরের প্রতীক্ষা করে নি, সে খুব সহজভাবে কয়েকটি কথা অনর্গল বলে গেল :—

আপনাদের মস্ত ভুল হচ্চে—আপনারা সবটা না জেনেই হরেন-দাকে অপরাধী মনে করে নিচ্চেন। অপরাধ আমরা এক বিন্দুও করিনি—তাই ভয়ও আমরা কারুকে করিনে। যদি ধর্ম্মের জন্যে সত্যের জন্যে আপনারা খোঁজ নেন ত' দেখ্‌বেন, কি ভুলই মানুষ মিছি-মিঁছি করে। মানুষ মানুষের বিচার করতে পারে না—তাই বিচারের প্রার্থনা করে এ-সব কথা বল্‌চিনে। বল্‌চি এই কথাই মনে করে যে, আমাদের প্রতি অবিচার করে বিশেষ করে এই নির্দ্দোষ হরেনদাদার উপর অবিচার করে আপনি নিজেই না অপরাধী হয়ে পড়েন! এমন একদিন আসবে যেদিন এই মিথ্যের কেল্লা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে—সেদিন কিন্তু এ জগতে আপনাদের দুঃখ রাখ্‌বার আর স্থান থাকবে না।

হরনাথের আর সহ্য হলো না! তিনি উঠে পড়ে বাঘের মত

আক্রোশে কমলাকে আক্রমণ করে তার টুঁটি টিপে ধরে হিড় হিড় করে টেনে খিড়কির দোর দিয়ে বার করে দিয়ে বল্লেন—হারামজাদি, এই ক'দিনের মধ্যে থিয়েটার করতে শিখে এসেচিস্! চুলোয় যা—আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে না।

তারপর খিড়কির দরজা সশব্দে বন্ধ করে তাতে তিনি চাবি লাগিয়ে দিলেন।

হরনাথের কাণ্ড দেখ্‌তে সবাই ব্যস্ত ছিল, হরেন যে এর মধ্যে কখন কেমন করে বার হয়ে গেছে, তা কেউ দেখ্‌তে পায়নি।

যোগেন্দ্র যেমন স্তব্ধ গম্ভীরভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই বাড়ী ফিরে গেলেন! অল্পক্ষণের অভিজ্ঞতাটুকু যে জীবনের দুর্লভতম বস্তু হয়ে একদিন দাঁড়াবে—তা তখন তিনি বুঝ্‌তেও পারলেন না!

... ...

কিছুক্ষণের জন্য কমলা নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করে অবিশ্রাম কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু কেঁদে মানুষের দিন যায় না। আকস্মিক নির্ম্মম আঘাতে ছড়িয়ে-পড়া মনটিকে আবার সে গুটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

তার সব-চেয়ে বড় ভয়ের জিনিষ হলো—মানুষের সান্ত্বনা কি সহানুভূতির কথা। তাই সে ধীরে ধীরে উঠে বাগানের এক কোণে যে নিবিড় বাঁশের জঙ্গল ছিল, তার মধ্যে ঢুকে গেল। সেখানে যারা প্রাণের আশা রাখে, তারা যে কিছুতেই আস্‌বে না—তা সে ভাল্ো করেই জান্‌ত।

সেখানে বসে সে বেশ ভালো করে বুঝে নিতে চাইলে যে কি করবে। তারপর হাত দু-খানি জোড় করে একান্ত মনে সে ডাকলে—হে ভগবান্, শুনেছি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি! এখন দেখিয়ে দাও, কোন্ পথ আমার পথ। আমি যে কিছু জানিনে!

ঠিক এই সময়ে তার হরনাথের কথাগুলো মনে পড়ল। সত্যি—যমই কি এখন তার শেষ আশ্রয়?

একটা ভীষণ আতঙ্কে তার সমস্ত দেহে-মনে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। আত্মহত্যা? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। শুনেছি, তাতে আত্মার অনন্ত নরক।—কেন আত্মহত্যা করব? কি হয়েছে আমার? কি করেছি আমি? কিন্তু এই বাঁশ-বনের মধ্যেও ত' জীবন যাপন করা সম্ভব নয়! কিছু একটা উপায় করতেই হবে—একটা ত আশ্রয় চাই—চাই।

কমলা গালে হাত দিয়ে আবার ভাব্‌তে লাগ্‌ল। হায়! আজ যদি সতীশ কাছে থাকৃত! সে নিশ্চয়ই এমন করে অবিচার করত না।

করত না? ঠিক কি তাই? আচ্ছা, এমন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন কেন তিনি? শোকে? না দুঃখে? কমলা আস্তে আস্তে মাথাটি নেড়ে বল্লে—কি শক্ত মানুষকে বোঝা! সবই ত অনুমান!—অনুমান যে সত্য হবেই হবে—তা কে বল্‌তে পারে!

সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—বাবা, আর যে ভাব্‌তে পারিনে—কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে—কতক্ষণে গ্রামের লোক ঘুমিয়ে

পড়বে।—তখন আমি যে-দিকে দু-চোখ যায়, সেইদিকে চলে যাব।

মাথাটা হাঁটুদুটোর মাঝখানে রেখে কমলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল—মন আর ভাব্‌তে চায় না—যা হবার হবে। মানুষ নিজের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন তিক্ত হয়ে ওঠে -তখন অপরের কথা আপনিই এসে জোটে।

তাই কমলা হরেনের কথা ভাবতে বস্‌ল। জেঠামশাই ত' তাকে ত্যাগ করেছেন; কিন্তু সে পুরুষ মানুষ,—কি ভাবনা তার! সব্বাই কিছু বাপের বিষয় পায় না। কত স্বাধীন এই জাতটি—আর কি বাঁধনেই বাঁধা আছি আমরা। হায় রে!

কমলা যখন এম্‌নি করে পুরুষের সুখ-সুবিধাগুলো তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে তৌল করচে—তখন দেখ্‌লে, পুকুরের পাড়ের উপর শশী এসে দাঁড়িয়েছে—তার কাণা চোখটি তার দিকে, আর ভালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের একদিক থেকে আর-একদিক পর্য্যন্ত সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্চে। সে যে কিসের খোঁজে এসেচে, তা বুঝ্‌তে কমলার একটুও দেরী হলো না—এই সয়তানের দোসর দেখ্‌তে এসেচে যে কতক্ষণে তার শবটা জলের উপর ভেসে ওঠে!

কমলা ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে চুপটি করে বসে রইল! শশী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে বল্লে,—এত শীগ্‌গির ভাসবে না;—কাল সকালে ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে উঠ্‌তেই হবে, বাবা।

তার মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠ্‌লো—যা দেখে যমও আঁৎকে ওঠে। কমলা ভয়ে শিউরে উঠে চোখদুটো তাড়াতাড়ি বুজে ফেল্‌লে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। বাঁশবনের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা সন্ধ্যার আগমনী কিছু আগে-ভাগেই সুরু করে দিলে।

কমলা স্তব্ধ হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে রইল। শশী বাড়ী চলে গেল। মাঠ থেকে ফিরে আস্‌বার পথে গরুর গলার ঘণ্টাগুলো ক্রমেই বেশী শোনা যেতে লাগ্‌ল।

চারিদিকের শব্দ—ক্ষীণালোকের সঙ্গে যেন এক শান্ত-মধুর মায়া রচনা করে কমলার চোখের উপর তন্দ্রার একটা পাৎলা পর্দ্দা টেনে দিলে।

কমলা হঠাৎ চম্‌কে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে বল্লে,—কৈ, তিনি ত আসেন নি! ওমা—আমি কি স্বপন দেখ্‌লুম না কি? এ ত সেই বাঁশ-বন—তেম্‌নি করেই ত বসে আছি!

দুর্নিবার আবেগ তার সমস্ত হৃদয়-মনকে নির্দ্দয় পীড়নে মথিত করে যেন তার দম বন্ধ করে দেয় আর কি! তার দুই চোখ ফেটে অজস্র অশ্রুর ধারা বয়ে গেল।

২৮

সতীশ যে ট্রেণে উঠেছিল সেটা একটা গাধা প্যাসেঞ্জার। অর্থাৎ তার গতির চেয়ে স্থিতি বেশী, আর চলার মুখে সে

কাউকে, ক্ষুব্ধ মেলের মত, অনাদর অবহেলা দেখিয়ে চলে যায় না। এই মন্থর-গতি গাড়ীখানার মধ্যে তার বেগবান মনটা খাঁচায়-পোরা পাখীর মতই সমস্ত দিন ছট্-ফট্ করতে লাগ্‌ল।

দুপুরের কড়া রোদে গাড়ীখানা থাম্‌লে তার ভিতরে আর থাকা যায় না। প্ল্যাট-ফরমেও ভীষণ রোদ—এমনি করতে করতে শেষে শেষ-বেলায় মোগলসরাইএ এসে গাড়ীখানা একেবারেই দাঁড়িয়ে গেল। সতীশ সেখানে জলযোগ করে নিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারি করে বেড়াতে লাগ্‌ল।

ওদিককার প্ল্যাটফরমে গাড়ীখানা এসে লাগ্‌ল—তা থেকে কত লোক পিল্ পিল্ করে নেমে পড়ে এই গাড়ীখানার দিকে ছুটচে! মেয়েরা এই গরমেও লাল নীল সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে দিয়ে তাঁদের লজ্জা রক্ষা করচেন—কিন্তু গরমে প্রাণ তাঁদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেচে, যেন ওষ্ঠাগত প্রায়!

একজন বিধবা ছুটে এসে সতীশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, এই গাড়ীখানা কি বর্দ্ধমান যাবে?

সতীশ হাঁ বলাতে তিনি ছুটে গিয়ে একখানা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীতে চড়ে বসলেন। শেষাশেষি একজন কালো উর্দ্দি-পরা টিকিট কালেক্‌টার এসে সেই গাড়ী থেকে বেচারাকে নেমে যেতে বল্লে; বিধবা ভয়ে অস্থির—বাবা, এক কোণে গুড়িসুড়ি হয়ে বসে যাব—থাক্‌তে দাও—নাম্‌লেই গাড়ী ছেড়ে দেবে।

কেউ কারুর কথা বোঝে না; টিকিট কালেক্‌টরটি হিন্দুস্থানী।

সতীশ গিয়ে বল্লে—মা, আপনি অন্য গাড়ীতে যান—এটা তুনো ভাড়ার গাড়ী।

বিধবাটি নেমে পড়ে বল্লেন,—বাবা, তোমার গাড়ীতে আমাকে বসিয়ে নেও। না জানি পথ-ঘাট, বড় বিপদে পড়েই একলা বেরিয়েছি।

—আচ্ছা তবে আসুন—বলে সতীশ তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল—আর দেরী নেই ; গাড়ী ছেড়ে দিলে বুঝি !

গাড়ীটা নড়ে উঠ্‌তেই সাম্‌নের একখানা গাড়ীর দোর খুলে বিধবাটিকে তুলে দিয়ে সতীশ সেই গাড়ীতেই উঠে পড়্‌ল।

এই বিধবাটির বয়স প্রায় চল্লিশ। রংটা এক সময়ে উজ্জ্বল ছিল ; কিন্তু দুঃখে-কষ্টে আর সে জেল্লা নেই। চুল একটিও পাকেনি, কিন্তু ছোট করে ছাঁটা। কপালে আর নাকের উপর নীল উল্কির দাগ।

ছুটোছুটির উত্তেজনার দরুণ উদ্বেগটা কমে গেলেই তিনি বল্লেন,—তুমি কোথায় যাবে, বাবা ?

সতীশ বল্লে,—আমিও বর্দ্ধমানের কাছেই নামব, তারপর আমাকে জগদীশপুর যেতে হবে—সে বেশী দূর নয়।

বিধবা বল্লেন,—জগদীশপুর ? আহা ! মনে করতেও দুঃখ হয়। আমার দুর-সম্পর্কের এক মাসী থাকেন সেখেনে। উপযুক্ত পুত্তুর—কি ক্ষেতিই হয়ে গেল বাবা—আবাগী বৌ মাগীর জন্যে। বৌ মাগী, শুন্‌চি, তার বাপের বাড়ীর দেশের জমিদারের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই কথা শুনে মাসির

ছেলে একেবারে লোটা-কম্বল নিয়ে কথায় যে নি-উদ্দেশ—হায়, হায়, মাসীর কপাল ধরেচে। এমন বেটা—শুনি না কি পশ্চিমে কোথায় পাঁচশ' টাকার চাক্‌রি করত,—সব জলাঞ্জলি দিয়ে চলে গেছে। ধন্যি মন পুরুষের। কি ভালই যে বাস্‌ত ছোঁড়া ঐ বৌ ছুঁড়িকে। তাই বলি বাবা, রাখ্‌লে কি সে তোর ভালবাসার মান? তাই বলে ভেবে ভেবে তুই কেন বসে গেলি? বৌ ছুঁড়ির নাকি অসামান্যি রূপ; হোক্‌ না কেন রূপ—বাংলা দেশে অমন ঢের-ঢের মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—কে পোঁছে! সোজা কথা বাবা পাঁচশ' টাকা মাইনে?

পরচুল-পরা নিজের ছবি যেমন আর্শিতে দেখে কিছুতেই হাসি সামলানো যায় না, সতীশের অবস্থা ঠিক তেমনি হলো—তার নিজের এই অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে। এই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ার সব-চেয়ে ব্যথা বেশী ঐ পাঁচশ' টাকার চাক্‌রিটির জন্যে। সতীশ মনে মনে হেসে বল্লে,—কি চাক্‌রি-প্রিয়তা এদেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতার!

সতীশ বল্লে,—আপনি থাকেন কাশীতে,—এত খপর আপনাদের কাছে পৌঁছল কি করে?

বিধবা একটু হেসে বল্লেন,—বাবা, বিদেশে থেকে আপনার জনের জন্যে কত যে মন হাঁক-পাঁক করে—তা তোমরা বোঝ না, পুরুষমানুষরা। তা ছাড়া—আরো একটু কারণও আছে। আমার মাসীটি ঐ বৌ-ছুঁড়িকে বরাবরই দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না। তাঁর ছেলের আর একটি বে দেবার ইচ্ছেও

তাঁর ছিল—আমার পিস্‌তুতো ননদের এক মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও অনেকটা এগিয়েছিল ; কিন্তু যাক্ সে সব কথা—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে মেয়েটির বে হয়ত' আস্‌চে মাঘ মাসে হয়ে যাবে।—সতীশ এই কথাগুলো বেশ সয়ে নিতে পারছিল, তার মানে সে মনে মনে স্থির জান্‌ত যে, কমলা এখন তাদের বাড়াতে তার মাকেই শুশ্রূষা করচে।

বিধবা আর বেশীক্ষণ জেগে থাক্‌তে পারলেন না—একটি কোণে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হওয়াতে সমস্ত দিনের হায়রানির পর সতীশের ঘুমটা ভালই হলো—তার উপর আবার আগের রাতটা একেবারেই অনিদ্রায় কেটেছে।

সকালে মধুপুরে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই সে নেমে পড়ে উপরি-উপরি দু-কাপ চা খেয়ে শরীরটাকে ধাতে নিয়ে এলো। বিধবা বৈদ্যনাথের পাণ্ডার কাছে কিছু নির্ম্মাল্য আর প্রসাদি পেঁড়া সংগ্রহ করে নিলেন গাড়ীতে প্রসাদ-ভক্ষণটা বৈধব্যধর্ম্মে বাধে না—এ কথা পাণ্ডা অনেকবার করে শুনিয়ে দিলে।

গাড়ীটার বর্দ্ধমানে এসে ঠিক বেলা চারটের সময় পৌছবার কথা ; কিন্তু কি একটা কারণে আসান্‌সোলে ঘণ্টা-দুই দেরী হয়ে গেল--তাই একেবারে অপরাহ্ণে এসে গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌছল।

সতীশের সহযাত্রিণী নেমে গেলেন। যথাসময়ে সতীশও বেলতলি ষ্টেশনে নেমে সটান একটা কুলির সঙ্গে বাড়ী রওনা হয়ে পড়ল।

পথ অতিক্রম করে যতই বাড়ীর দিকে আসে, ততই যেন

তার মনটা উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মার অসুখ—তিনি কেমন আছেন? যাক্‌গে, সে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া—দু-চার দিন নেটিয়ে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। তার পর তার কমলার কথা মনে হলো।

বৌকে যদি মা বাড়াতে জায়গা না দিয়ে দূর করে দেন! না—তা কি হয়? আমাকে না জানিয়ে—তাইত, আমি ছিলুম কোথায়? ইস্‌, তাই ত কি ভুলই করেচি! হে হরি—হে মা দুর্গা—এমন যেন না হয়।

গ্রামের মধ্যে যখন সে ঢুক্‌ল, তখন বেশ রাত হয়েছে। কারুর সঙ্গে দেখা হবার মত সময় আর নেই। সতীশ দুর্গানাম জপ করতে করতে এসে ভূপেন-ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারির কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—ডাক্তার নেই, কম্পাউণ্ডার একটা ভাঙা বেঞ্চে বসে একখানা বাংলা কাগজ খুলে পড়চে।

সতীশ চেঁচিয়ে বল্লে, ওহে নিতাই, ডাক্তার কোথায়?

—আজ্ঞে তিনি এইমাত্র একটা কলে বেরিয়ে গেলেন।… আপনি কবে এলেন? দরকার আছে নাকি? ফিরে এলে পাঠিয়ে দেব?

ভূপেন ডাক্তার কলে যাননি—তিনি বাড়ী গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা বলা নিষেধ ছিল—সব সময়েই তিনি কলে যান্‌ এই রকম বলার কড়া হুকুম এই বেচারার উপর ছিল।

সতীশ বল্লে—না, মা আছেন কেমন, জানো কিছু?

—আজ্ঞে তাঁর ত কুইনাইন চল্‌চে।

সতীশ একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর সাম্‌নে এসে তার বুকের মধ্যটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল।

কুলিটা হাঁকাহাঁকি করতে স্বয়ং দুর্গামণি এসে দোর খুলে দিয়ে মানুষ ভূত দেখ্‌লে যেমন করে চেয়ে থাকে, তেম্‌নি করেই চেয়ে রইলেন—তারপর হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সতীশ তাঁকে নিরস্ত করে বাড়ার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কুলি বিদায় করার পর তাঁর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুনে উপলব্ধি করলে—যে কালনাগিনা এসেছিল আর ঠেক্যর করে বাপের বাড়ী চলে গেছে; তিনি তাকে বিধিমতে ঠাকুরসেবা করেছিলেন—কিন্তু—

সতীশ কোন কথা না কয়ে বাড়া থেকে ধীরে ধীরে বার হয়ে কালাগ্রামের পথ ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন স্নান নেই, আহার নেই—তার পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবীটা যেন টল্‌তে লাগ্‌ল—তবুও সে চল্‌চে—চল্‌চে—চল্‌চে।

স্তব্ধ মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার আর পা চলে না। একটা উঁচু আলের উপর বসে পড়ে সে কালাগ্রামের দীর্ঘ পথের দিকে চেয়ে রইল—এই পথ তাকে অতিক্রম করতেই হবে—যেমন করে হয়!

খানিক বিশ্রাম করবার পর আবার সে চল্‌লো—কিন্তু আর ত চলা যায় না ভগবান্! পা যে ভারী পাথর হয়ে উঠেচে!

একটা ছোট্ট নিমগাছের তলায় সে বসে পড়ল। চারিদিকে চাঁদের আলো ফুট্-ফুট্ করচে—আর সাম্‌নে ধূ-ধূ অফুরাণ পথ! সতীশ চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করে আবার উঠ্‌তে গিয়ে দেখে—কে ঐ পথের উপর দিয়ে ত্রস্ত পদে ছুটে চলেচে? মেয়েমানুষ, না?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই কতকগুলো শুক্‌নো পাতা খড়মড় খড়মড় করে উঠ্‌তেই মেয়েটি পথের ধারে নিসিন্দের ঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

সতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে মেয়েটি আবার বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ তার মুখ থেকে বার হয়ে পড়ল—কে যায় ও? কমলা!

সে স্বর শুনে সেই পথের ধূলার উপর চক্ষের পলকে কমলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

তার নিস্পন্দ দেহখানি নিজের কোলের উপর টেনে নিতে নিতে সতীশের দুই চোখে অশ্রুর সাগর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

২৯

বাল্মীকির বাঙালী দোহার কৃত্তিবাস ওঝা সতীশের মনের কাণে বল্‌তে যাচ্ছিলেন "অগ্নি-পরীক্ষা!" কিন্তু কমলার "না হ'তে দহন তনু পতন হইল আগে!" সতীশের মনের চোর-কুঠুরীর অন্ধকারে একটা অনাহূত দ্বিধা যেমন নিমেষের মধ্যে উদয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হ'য়েছিল তেম্‌নি নিমেষের মধ্যেই তলিয়ে গেল। অন্তর্যামী বল্লেন "অগ্নি-পরীক্ষা নয়, অজ-বিলাপ।"

উচ্ছ্বসিত চোখের জলের প্রথম বেগটা সাম্‌লে নিয়ে মূর্চ্ছাহত কমলার মূর্চ্ছা ভাঙাবার জন্যে, তার ঘোম্‌টা-মুক্ত মাথাটি আস্তে আস্তে তাল-পাকানো উড়্‌নীর বালিশের উপর নামিয়ে রেখে, সতীশ, একটু জলের চেষ্টায় ওঠ্‌বার উদ্যোগ করছিল। ঠিক এই সময়ে একটা শাদা মেঘ স'রে গিয়ে, একরাশ চাঁদের আলো, কমলার নির্ম্মল মুখের উপর এসে পড়্‌ল। সতীশ উঠ্‌তে গিয়ে মুগ্ধের মতন বসে পড়ল!...

সেই কমলা! বিয়ের আগে, ঘাটের পথে যার পদ্মফুলের মতন শুচি-সুন্দর মুখখানি দেখে সতীশের সন্ন্যাসী মন সংসারী হ'য়েছিল! সেই কমলা!...তেম্‌নি সুন্দর, তেম্‌নি নির্ম্মল! বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টির সময়, তার উপবাসক্লিষ্ট কচি মুখখানি যেমন দেখেছিল, সতীশের মনে হ'ল, আজও সে মুখ তেম্‌নিই আছে, তেম্‌নি নির্ম্মল, তেম্‌নি নিষ্কলঙ্ক। বিয়ের ফিরে-বছর, ঘর-বসতের সময়, বাপের বাড়ী থেকে এসে এম্‌নি একদিন কমলা, সতীশের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিছানার উপরে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। সেদিন সতীশ বন্ধুদের মজলিস্‌ থেকে, তাঁদের কাছে নিজের মনের জোর দেখাবার জন্যে, বেশ-একটু বেশী রাতেই বাড়ী ফেরে। ছেলেমানুষ কমলা, দরজা খোলা রেখে, ঢুলে ঢুলে, শেষে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। নিদ্‌-মহলে, জ্যোৎস্না-সায়রে, এই কমলকে দেখে সেদিন যেমন সতীশের স্বপ্নাবিষ্ট হৃদয় তার কুণ্ঠিত ঠোঁট-দুটিকে ঘুমন্ত কমলার

পুষ্পাধরের দিকে অতর্কিতে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সতীশ বুঝ্‌তে পারলে, আজও তাই ঘট্‌তে বসেছে। আর এ-কথাও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে, যে, যা ঘট্‌তে বসেছে, তা' রোধ করবার শক্তি, আত্মানন্দ বাবাজীর প্রিয় শিষ্য বৈরাগ্যবাগীশ সতীশচন্দ্রের এক-কড়াও নেই। ঘুমন্ত-ছবি কমলার পূরন্ত ঠোঁট-ছুটির ছুরন্ত আকর্ষণে বৈরাগী সতীশের ঘাড় তিলে তিলে ঝুঁকে পড়তে লাগ্‌ল। গেরুয়ায় গোলাপীর আমেজ ছাখা দিলে। মমত্বের সুপ্ত বীণার সমস্ত তার একসঙ্গে হঠাৎ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এই একটা মুহূর্ত্তের একফোঁটা আতরে হাজার জ্যোৎস্না-রাতের হাজার হাজার জুঁই-চামেলি, যেন কাতার দিয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

ঠিক এই সময়ে মূর্চ্ছিত কমলার নিস্পন্দ দেহ একটু ন'ড়ে উঠ্‌ল। স্বপ্নাবিষ্ট সতীশের হুঁস হ'ল; সে দেখ্‌লে কমলা চোখ মেলেছে—মূর্চ্ছা-নাগিনীর নাগপাশ খুলে গেছে। তার অসমাপ্ত চুম্বনের চুম্বক আকর্ষণে কমলা চেতনার রাজ্যে ফিরে এসেছে। সতীশ ফিশ্‌ ফিশ্‌ স্বরে ডাক্‌লে, "কমলা!" কমলা কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, বোধ হয় বল্‌বার শক্তিও তার ছিল না। তার খোলা চোখছুটো কেবল কূলে কূলে ভ'রে উঠ্‌ল। আর তারপর টস্‌ টস্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

বক্তব্যকে চাপা দিয়ে কান্নার বেগ এবং কান্নাকে চাপা দিয়ে বক্তব্য কথা, ক্রমাগত ঠেলাঠেলি ক'রে, আগে বেরিয়ে পড়্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, সতীশের কণ্ঠের সমস্ত শিরা-উপশিরা গুলোকে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে তুল্‌লে। সে কিছু না বল্‌তে পেরে

কেবল উচ্ছ্বসিত চোখের জলে কমলাকে অভিষিক্ত করতে লাগল। এইরকম ক'রে ভাবের প্রথম আবেগ কতক পরিমাণে শান্ত হ'লে সতীশ ভাঙা গলায় বল্‌লে, "কেঁদ না। কমল, আমি ক্ষিতীশ বাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি।"

কমলা তার হরিণের মতন আয়ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্লে, "শুনেছ?···এমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়।" ব'লে সে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল এবং তার কল্‌কেতা প্রবাসের ইতিহাস বল্‌তে সুরু কর্‌লে। সতীশের মন তার অজ্ঞাতসারে কমলার রিপোর্টের সঙ্গে ক্ষিতীশ বাবুর রিপোর্ট প্রতিপদে মিলিয়ে চল্‌ছিল এবং মিল দেখে খুসী হচ্ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই ব্যাপারটা সতীশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, সে যেন নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "থাক্, থাক্, তোমার কষ্ট হচ্চে, তুমি এখন ক্লান্ত আছ, আর ও-সব আমি শুনেছি···সমস্তই শুনেছি।"

চাণক্য, সতীশকে তর্জ্জনী তুলে বল্‌ছিলেন—

"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু"

কিন্তু তার ফিরে-পাওয়া সুন্দরী স্ত্রীর সুন্দর মুখের সাম্‌নে সে চাণক্যের ঐ কথাটা কিছুতেই মান্‌তে পার্‌লে না। সুন্দরকেই সতীশ সত্য ব'লে গ্রহণ করলে।

কমলা কিন্তু তার এই কথায় যেন ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্‌লে, "তা হ'লে তুমি আমায়···ঘেন্না কর না?...আমায় অবিশ্বাস কর না?" শেষ-কথাটা উচ্চারণ করতে তার গলা কেঁপে গেল, চোখ্ আবার ছল্‌ছলিয়ে এল। সতীশ স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে,

"মোটেই নয়, অবিশ্বাস করলে, আগ্রা থেকে, ধূলো পায়ে তোমার সন্ধানে কালীগ্রামে আস্‌তুম না।"

কমলা সোজা হ'য়ে সহজ হ'য়ে বস্‌ল। অপমানে, লাঞ্ছনায়, ধিক্কারে, অনাহারে, যার দেহ-মন ভেঙে পড়বার জো হ'য়েছিল, সতীশের এই ক'টি কথায় সে যেন মৃত-সঞ্জীবনী লাভ করলে। তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত কষ্ট যেন চোখের নিমেষে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল। কমলার মনে হ'ল, সে তার পুরোনো অধিকার ফিরে পেয়েছে। তাই তার প্রথম প্রশ্ন হ'ল, "আগ্রা থেকে আস্‌ছ,··· তা হ'লে খাওয়া হয়নি ?"

সতীশ বল্লে, "সে হবে এখন, তোমার ? তোমারও বোধ হয় হয়নি।"

কমলা চুপ ক'রে রইল। তুজনে খানিকক্ষণ নীরব হ'য়ে রইল। তারপর হঠাৎ বিনা জিজ্ঞাসায়, সতীশ তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ ইতিহাস বল্‌তে সুরু করলে, উড়ো চিঠির কথা, তীর্থ-পর্য্যটনের কথা, আগ্রার কথা, ক্ষিতীশের কথা। সতীশ কিছুই গোপন করলে না, সে স্পষ্টই বল্‌লে, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, উড়ো-চিঠিতে তোমার সম্বন্ধে যে সব কুৎসিত কথা লেখা ছিল, সে সব ঠিক বিশ্বাস না হলেও, মনে কেমন যেন একটা ধোঁকা জমেছিল। কিন্তু ক্ষিতীশ যখন বল্‌লে যে তার মায়ের চরিত্র সে যেমন নির্ম্মল, যেমন নিষ্কলঙ্ক ব'লে মনে করে, তোমার চরিত্রও ঠিক তেম্‌নি ব'লেই মনে করে, তখন, তার সেই কথা, তার চোখের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি, তার স্বরের দৃঢ়তা সমস্ত মিলে, দক্ষিণে হাওয়া

যেমন ঘোলাটে কুয়াসা কাটিয়ে ছায়, তেম্‌নি ক'রে, আমার মনের ধোঁকা কাটিয়ে দিলে। যার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তার চরিত্রের সঙ্গে কেউ নিজের মায়ের চরিত্রের তুলনা দিতে পারে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তা হ'লে তুমি আমায় বিশ্বাস করো ?"

সতীশ বল্‌লে, "নিশ্চয়।"

"আগেকার মতন ?"

"নিশ্চয় !"

কমলা প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে চোখের জলে সতীশের পা ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চোখ মুছে সে বল্‌লে, "তুমি অবিশ্বাস ক[illegible]না[illegible]ই আমার যথেষ্ট, এখন ম'লেও আর দুঃখ নেই।"

সতীশ বল্‌লে, "যাক্‌ ও-সব ছাই কথা, চল বাড়ী যাই।"

কমলার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "বাড়ী ?···বাড়ীতে কি মা আমায় জায়গা দেবেন ?"

"আমায় যদি স্থান অবিশ্যি তোমাকেও দিতে হবে।···ভালো কথা, মার অসুখ শুনে, তুমি শুন্‌লুম, বাড়ী গিয়েছিলে···তারপর ?"

কমলা খুব দ্রুত অথচ খুব ছোট্ট ক'রে ঘাড় নাড়্‌লে, জ্যোৎস্নায়, তার চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

সতীশ বল্‌লে, "ও ! বুঝেছি, মা তোমার সেবা গ্রহণ করেন নি। আচ্ছা সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।···তুমি যখন বাড়ীতে যাও, তখন মা একলা ছিলেন, না আর কেউ ছিল ?···ছিল,···

হুঁ···বুঝেছি,···পাড়ার গুলমুখী গোবর-সোহাগীর দল কাছে থাক্‌লে মা যেন আর এক মানুষ হ'য়ে যান্‌···এই স্থাখনা, মা তো তোমায় অত ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু, ওদের মন্ত্রণায় আমার আবার বিয়ে দেবার ধুয়ো তুলেছিলেন। কি সদাচার, না বউএর ষোলো বছর উৎরে গেল অথচ ছেলে হ'ল না।···যাক্‌,···আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। শুচিবাই ছোঁয়াচে রোগ; গোবর-সোহাগীদের আব্‌-হাওয়া থেকে সরিয়ে আন্‌তে পার্‌লেই মা, যেমন স্নেহময়ী ছিলেন, আবার তেম্‌নিই হবেন; তুমি দেখে নিও। মায়ের মত করবার ভার আমার— এখন চল—চল্‌তে পার্‌বে ত ?"

কমলা মুখে বল্‌লে "পার্‌ব", কিন্তু গ্রামের রাস্তা ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে প্রতিপদেই সতীশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে, কমলা আর পারছে না।—তাই সে প্রস্তাব করলে, "আজ হাট-বার; হাটের ফির্‌তি গোরুর গাড়ীর জন্যে মোড়ে এগিয়ে অপেক্ষা করা যাক্‌।"

মৈত্রমশায়ের বাড়ী দূর নয়, কিন্তু সতীশ সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত কর্‌লে না। এত রাত্রে কমলাকে জগদীশপুরের পথে দেখে, সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিল, বাপের বাড়ী কমলা আশ্রয় পায় নি। একবার ভাব্‌লে সোজা তুজনে পশ্চিমেই যাবে, কিন্তু এত রাত্রে পশ্চিমের কোনো গাঁড়ীই বেলতলিতে থামে না, কাজেই জগদীশপুরের রাস্তা ধ'রে তুজনে পা টেনে টেনে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ধুৎরো ফুলের ঝোপে গোটা-কয়েক জোনাকী লুকোচুরি খেল্‌ছে। ঝিঁঝি ডাক্‌ছে। ফুর্‌ফুরে বাতাসে বকুল গাছের পাতাগুলো গা-টেপাটেপি কর্‌ছে। আর সেই স্থির জ্যোৎস্নার

অকূল পাথারে পাড়ি দিয়ে চলেছে দুটি প্রাণী; অশ্রুস্নাত, নিষ্কলঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ। কমলার মনে জাগ্‌ছিল তাদের বিয়ের রাতের কথা, মিলন-রাতের কথা, সেদিনও এম্‌নি জ্যোৎস্না। তার মনে হচ্ছিল এ যেন ঠিক সেইদিন! সারাদিন উপবাসের পর সেদিনও শরীরটাকে এম্‌নি হাল্কা বোধ হচ্ছিল, মন জুড়ে ছিল আশঙ্কার সঙ্গে আশার আনন্দ, আজও ঠিক তাই!

সতীশের মনেও যে ঐ কথাই উঠ্‌ছিল তা' তার কথাতেই প্রমাণ হ'য়ে গেল; সে বল্‌লে, "কমলা, আজ তোমারও উপোষ আমারও উপোষ; মনে পড়ে বিয়ের দিন?—সেদিনও এম্‌নি দুজনেরই উপোষ ছিল, আজ আমাদের নতুন বিয়ে—ফিরে-ফির্‌তি।"

কমলা মৃদু হেসে বললে, "হ্যাঁ ফিরে-ফির্‌তি।"

হঠাৎ দূরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কে প্রাণপণ চেঁচিয়ে গাইছে।

"ওহে দীনবন্ধু হরি!
একবার ছাখা দাও, রাঙাচরণ দু'খানি॥

গোরুর গাড়ীর খবরাখবর পাবার আশায় সতীশ ও কমলা থম্‌কে দাঁড়াল। লোকটা নিকটে এলে, সতীশ বল্‌লে, "ওহে মোড়লের পো, এদিকে গোরুর গাড়ী-টাড়ী আসতে দেখেছ?"

লোকটা গানের রসভঙ্গ হবার ভয়ে শুধু একটা "না" ব'লেই পূর্ব্ববৎ চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল।

সতীশ কমলাকে বল্‌লে, "লোকটাকে গানে পেয়েছে।"

কমলা বল্‌লে, "চাঁদের আলো দেখে ফুর্ত্তি লেগেছে।"

সতীশ বল্‌লে, "হুঁ-উঁ-উঁ, ফুর্ত্তি ব'লে ফুর্ত্তি, একেবারে স্বভাব-কবি দাঁড়িয়ে গেছে, "দীনবন্ধু হরি"র সঙ্গে "রাঙা চরণ-দুখানি" মিল্‌ দিচ্ছে, দেখ্‌ছ না।"

কমলা ছন্দ-মিলের ধার ধার্‌ত না, কিন্তু এই স্পষ্ট গরমিলটা সতীশ যখন দেখিয়ে দিলে, তখন সেও হেসে উঠ্‌ল।

চল্‌বে কি ঐখানেই দাঁড়িয়ে গাড়ীর অপেক্ষা কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে দুজনেই ইতস্তত কর্‌ছে এমন সময়ে কমলা বল্‌লে, "ওই শোনো,—আবার গান—এবার কিন্তু গোরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চাকার শব্দও শুন্‌তে পাচ্ছি।

সতীশ কান পেতে শুন্‌লে সত্যিই গাড়ী আস্‌ছে। গাড়োয়ান গাইছে ;—

"যাও হে, যাও হে, ও কালাচাঁদ !
তুমি আর এস না আমার বাড়ী
এবার এলে আমার বাড়ী
দেব তোমায় খ্যাংরার বাড়ী।"

বিংশ শতাব্দীর কালাচাঁদের এই রকম বীভৎস অভ্যর্থনায় সতীশ হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে ঠিক করতে পারলে না। এমন সময়ে গাড়ী মোড় ফিরে প্রায় কাছে এসে পড়ল, তখন গাড়োয়ান গাইছে ;—

"বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়েনা হাঁড়ি।
(তোমার) খেতে মাখ্‌তে তেল জোটেনা
ক্যা—রা—সিনে
বাগাও তেড়ি—ই—ই!"

এই গাড়োয়ান-কুলের তানসেন নিকটে এলে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে, শেষে এক টাকায় রফা ক'রে সতীশ কমলাকে নিয়ে ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বস্‌ল এবং "পথে একবার নকৃড়ো ময়রার দোকানে গাড়ীটা যেন দাঁড় করানো হয়," এই ব'লে গাড়ী ছেড়ে দিতে বল্‌লে।

গাড়োয়ান "এজ্ঞে" ব'লে, বৈয়াকরণদের উপর টেক্কা দিয়ে মূর্দ্ধার গম্বুজে জিহ্বা টঙ্কৃত ক'রে বদল ছু'টোকে শাকটায়ণ-কৃত মূর্দ্ধণ্য ক-এর উচ্চারণ শেখাতে - শেখাতে, কানের বদলে বেচারাদের ল্যাজ মল্‌তে মল্‌তে জগদীশপুরের রাস্তায় রওনা হ'ল।

৩০

বিনাদোষে বারাম্বার লাঞ্ছনা সহ্য করে হরেনের মনটা অনেকদিন থেকেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ্‌কের এই পিতৃকৃত অপমানে তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বিষ হয়ে উঠল। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্যুৎ-ভরা তারের মতন তাকে প্রকশহীন বিহ্বলতার যন্ত্রণায় অস্থির ক'রে

তুল্‌তে লাগ্‌ল। চিরকালের সংস্কারের বশে সে বাপের কথার কোন জবাবই দিতে পার্‌লে না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বেরিয়ে চ'লে গেল। এতক্ষণ ধ'রে সে সমস্ত অবিচার সমস্ত অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু আর পার্‌লে না। তার সমস্ত আবেগ, বজ্রের মতন কারো উপরে প'ড়ে, কিছু একটা ভেঙে চুরে, তছ্‌ নছ্‌ ক'রে ফেল্‌বার জন্যে তাকে পাগল ক'রে তুল্‌ছিল। তাই যখন সকলের আক্রোশ কমলার উপর গিয়ে পড়েছে তখন সে নিজেকে একটা কুৎসিত অকাণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু না ভেবে-চিন্তে ত্যারছা হাউইয়ের মতন অন্ধ বেগে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল শশী মুখুয্যেকে; সেই মিথ্যাবাদী—সেই শয়তানই তো যত নষ্টের মূল। হরেন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে, তার রাগের খাপ্‌রা মাথার মধ্যে জ্বালিয়ে নিজেদের কাছারী-বাড়ীর দিকে একরকম ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে শুন্‌লে শশী অসুখের অজুহাতে ছুটি নিয়ে বাড়ী চ'লে গেছে; একজন আম্‌লা এইসঙ্গে এটাও হরেনকে জানিয়ে দিলে যে, অসুখ ছিলামাত্র। রাতের ট্রেণে ম্যাজিষ্ট্রেট কালীগ্রামে আস্‌ছেন, কাজেই সকলকে একটু বেশীমাত্রায় আজ দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে; শশী কিন্তু দৌড়ঝাঁপ মোটেই পছন্দ করে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে খুব পারে, পরের উপর মোড়লী করতে ওস্তাদ কিন্তু কাজের বেলায় চু-চু। তাই আগে-ভাগে অসুখের অছিলায় স'রে পড়েছে। হরেন শেষ-পর্য্যন্ত

না শুনেই শশীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। সেখানে হাজির হয়েই হরেন হাঁক দিলে "মুখুয্যে!" ত্যালাকুচোর লতায় ঢাকা একটা ছোট্টো জানালা ঈষৎ ফাঁক হ'য়েই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ জবাব দিলে না। কিন্তু হরেন খড়মের শব্দ স্পষ্ট পেয়েছিল। সে বেশ বুঝ্‌তে পারলে শশী বাড়ীতেই আছে, তাই ফের ডাকৃলে, "ওহে মুখুয্যে বাড়ী আছ, না জেগে ঘুমুচ্ছ!" অনেক চেঁচামেচির পর, কাণে-হাঁটা কইমাছের মতন একটা ঘুন্সি-পরা ন্যাংটাছেলে, শুকৃতলার মতন একটা আমসত্ত্বের ফালি লালায় ভিজাতে ভিজাতে তড়াং তড়াং ক'রে বেরিয়ে এল।

হরেন বল্লে, "এই পট্‌লা, তোর বাবা কোথায়?"

ছেলেটা আমসত্ত্বের দিকে জিভ্‌ বাড়াতে বাড়াতে ধীরে-সুস্থে বল্‌লে, "বাবা?—অ্যাঁ?—বাবা?—বাবা ঘড়ে—না, না, বেড়িয়ে গেছে।"

"তবে রে শূয়োর, মিছে কথা?" ব'লেই হরেন যেমন তার কান ধর্‌তে যাবে অমৃনি ছেলেটা চট্‌ ক'রে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে সমস্ত আমসত্ত্বটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

হরেন দরজায় একটা লাথি মেরে "লুকিয়ে ক'দিন থাকৃবে?" এই কথাটা চীৎকার-স্বরে জানিয়ে দিয়ে একটু তফাতে গোঁ-ভরে একটা আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল।

এম্‌নি অনেকক্ষণ বসে রইল। গাছের ছায়াগুলো মাথার

উপর থেকে, পূবে হেলে, আস্তে আস্তে লতিয়ে চড়ুকে সন্ন্যাসীদের মতন দণ্ডী কাট্‌তে কাট্‌তে এগিয়ে ক্রমশঃ লম্বা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সূর্য্য ডুব্‌ল। হরেন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়্‌ল। যাবার সময় আরেকবার শশীর দরজায় লাথি মেরে হন্ হন্ ক'রে বড় রাস্তার দিকে মোড় নিলে। তেমাথায় এসে হরেনের হুঁস হ'ল্ যে, রাগটা কমার সঙ্গে ক্ষিদেটা আবার যেন বেশ-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই থম্‌কে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনে গিয়ে সোজা রেলে উঠে বস্‌বে কি তার আগে হাট থেকে কিছু খাবার সংগ্রহের চেষ্টা দেখ্‌বে, এ বিষয়ে একটা মীমাংসার জন্যে মনিব্যাগটার ভিতরের খবর তলিয়ে দেখ্‌ছে, এময় সময় পিছন থেকে কে ডাক্‌লে, "হরেন দা!"

হরেন চম্‌কে উঠ্‌ল, ফিরে দেখ্‌লে অরুণ।

"অরুণ!"

"হাঁা হরেন দা" দিদিকে খুঁজ্‌ছি, তাকে তুমি এদিকে দ্যাখনি?"

"কেন? সে বাড়ীতে নেই?"

অরুণ মুখ ফ্যাকাশে ক'রে বল্‌লে, "না, বাবা তাকে বার ক'রে দিয়েছেন; আমাদের কাউকে, তাকে খুঁজ্‌তে পর্য্যন্ত যেতে দ্যান্‌নি, তিনি বাড়ী থেকে বেরুলে তবে বেরুতে পারলুম।—কিন্তু তাকে খুঁজে তো কোথাও পাচ্ছিনি। যাবার সময় বাবা দিদিকে বলেছিলেন "চুলোয় যা"—দিদি বড়

অভিমানী—সে কি সত্যি সত্যিই—” অরুণ আর বল্‌তে পারলে না, তার চোখ ছল্ ছল্ ক’রে উঠ্‌ল, সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হরেন রাস্তার মাঝখানে ধুলোর উপর বসে পড়্‌ল, সে যেন সমস্ত ভাবনার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, কিছু বুঝ্‌তে পারছে না, কেবল তার ফ্যাল্‌ফেলে তাকানি অরুণের মুখের উপর সমবেদনার প্রলেপ বুলিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অরুণ নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, “পাড়ার কারো বাড়ী যাবেনা, তাই কারো বাড়ী খোঁজ করিনি, তবে খিড়কীর বাগান, পঞ্চানন তলা, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল সমস্ত উট্‌কে পাট্‌কে দেখেছি, কোথাও নেই।”

হরেন বল্লে, “বিনা দোষে কি শাস্তি, ত্যাখো।” ব’লেই আবার ভাবনার অতলে যেন তলিয়ে গেল। মিনিট-খানেক পরে ব’লে উঠ্‌ল, “ষ্টেশনের দিকে যায় নি তো?—চল, ষ্টেশনের দিকটা একবার খুঁজে দ্যাখা দরকার।”

“ষ্টেশনের দিকে বাবা এইমাত্র গেলেন, আমি যাবনা, আমায় দেখ্‌লে রেগে উঠ্‌বেন।”

হরেন বল্লে, “কেন? ষ্টেশনে কেন?”

“ষ্টেশনে ঠিক নয়, রেল-লাইনের ওপারে, কে একজন যজমান নাকি মরণাপন্ন। তার অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে, তাই ডেকে নিয়ে গেল!—আমি ওদিকে যাব না,—তোমারও ওদিকে যাওয়া—”এই পর্য্যন্ত ব’লেই অরুণ থেমে গেল।

হরেন ভুরু কুঁচ্‌কে কি-যেন ভেবে নিয়ে বল্লে, "আমার জন্যে ভাবতে হবে না, তুই চল্। আর তিনি তো সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, তোরই বা ভয় কি ?"

অরুণের পা-দুটো যেন ইতস্তত কর্‌তে কর্‌তে হরেনের পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূর গিয়ে হরেনকে সম্বোধন ক'রে সে বল্‌লে, "হরেন দা, তোমার খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয় ?"

"না—তুই ?—তোরা খেইছিস্ ?"

"উঁহু,আমরা কেউই খাইনি, দিদি মুখের গ্রাস্ ফেলে চ'লে গেল,—তাই মা সমস্ত ভাত-তরকারী গোরুকে ধ'রে দিয়েছেন !"

"তাইতো অরুণ,—আমার জন্যে ভাবিনি,—তুই ছেলেমানুষ সমস্ত দিন খাস্‌নি—চল্, হাট থেকে কিছু খেয়ে নিবি চল্। আজ হাট-বার, ফল-টল খাবার-টাবার সব টাট্‌কা।"

"আর তুমি ?"

"সে হবে এখন—ষ্টেশন থেকে এসে" এই ব'লে দু'জনে আবার নীরবে চল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন আর অরুণ ষ্টেশনের পথে যেতে হাটের কাছে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। এক জায়গায় জনকয়েক লোক তাড়ি খেয়ে খুব মাদল পিট্‌ছে, তার মধ্যে একজন পেশাকরদের মতন ফেরৃতা দিয়ে কাপড় প'রে গোঁফ-দাড়ির উপর আড়-ঘোম্‌টা টেনে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ধরেছে :—

'খুব হ'ল লাচন্ দাদি !
বাবুরা হুকুম দিলে, লেগে গেল
লাচ-পাগলের গাঁদি !
(আমায়) লাচ্‌তে ব'লে সবাই মিলে
কর্‌লে সাধাসাধি !
(তাই) লেচে লেচে ধর্‌ল মাজা
(এখন) লাচ্‌তে বল্‌লে কাঁদি !"

মাতালের ভিড় দেখে হরেন অরুণকে দাঁড়াতে মানা কর্‌লে। তাড়ির গন্ধ নাকে যাওয়ায়, দুজনেই ক্রমাগত থুথু ফেলতে ফেল্‌তে এগিয়ে চল্‌ল। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেটের শুভাগমনের জন্যে নার্‌কোল পাতার তোরণ তৈরী হচ্ছে, কলাগাছের কবন্ধের উপর আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে। হরেনের সেদিকে খেয়াল নেই, সে অরুণকে কিছু খাইয়ে নেবার জন্যে টাট্‌কা ফলের সন্ধানে চোখ্ দুটো বিস্ফারিত ক'রে চলেছে।

খানিকদূর এগিয়ে দেখ্‌লে, আবার ভিড়। এবারে একেবারে লোকারণ্য ; ভাঙা হাটে হঠাৎ এমনধারা লোক-সামাগম কেন, তা জান্‌বার জন্যে, ছেলেমানুষ অরুণ আবার ভিড়ের ভিতর সেঁধিয়ে পড়ল, পিছনে পিছনে হরেনও ঢুকল। ভিড় ঠেলে একটুখানি এগিয়েই দেখ্‌লে, কপালে ফেট্টি-বাঁধা একজন স্ত্রীলোক কাঁদ্‌ছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

"চ'লে আয় অরুণ, কি দেখ্‌বি" ব'লে হরেন অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে, এমন সময় শুন্‌তে পেলে মাতালের গলায়

কে বল্‌ছে, "খবর্দ্দার চৌকীদার! বাগ্‌দী হ'য়ে বামুনের গায়ে হাত। ছুঁস্ নে বল্‌ছি, খবর্দ্দার! যমের বাড়ী যেতে হবে না ভেবেছিস্! বামুনের গায়ে হাত! শাপ-মন্যির ভয় নেই? খবর্দ্দার!"

হরেনের মনে হ'ল চেনা গলা! পরমুহূর্ত্তেই, দেখ্‌তে পেলে লোকটা আর কেউ নয়, শশী মুখুয্যে! শশীর গলা পেয়েই যে স্ত্রীলোকটি ব'সে ছিল সে দাঁড়োস্ সাপের মতন খাড়া হয়ে উঠ্‌ল এবং কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ওঃ, উনি বামুন, ওঁর শাঁপের ভয়ে লোকে তো ডরিয়ে গেল!

শাঁপে বামুন শাঁপে
আমার নখের কুণি কাঁপে,
আমার চোখের ভোঁয়া কাঁপে!
আমার ভুরুর রোঁয়া কাঁপে!

বাঁধ চৌকীদার বাঁধ। ছুঁড়ীকে একেবারে খুন ক'রে ফেলেছে গা!"

'খুন' শুনে হরেন ভিড় ঠেলে বাঘের মতন লাফিয়ে গিয়ে শশীর গলা টিপে ধর্‌লে।

ঝাঁকানি দিতে গিয়ে, হরেন চম্‌কে গেল, লোকটা যেন শোলার মতন হাল্কা, তার রাগের বেগ অর্দ্ধেক কমে গেল। ভিড়ের ভিতর একটা অস্ফুট কলরব উঠ্‌ল—"ছোট বাবু!" "ছোট বাবু!"

চৌকীদারকে ধমক দিয়ে এবং শশীকে আর একবার ঝাঁকানি

দিয়ে হরেন চেঁচিয়ে বল্‌লে, "তোরা এই অপদার্থটাকে এতগুলো লোকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারছিস্‌ নে? নে, বাঁধ।"

কলরব শুনে যারা পাতার গেট বাঁধতে বাঁধ্‌তে কাতাদড়ি আর কাটারি হাতে মজা দেখ্‌তে এসেছিল, তাদেরি একজন দড়ি জুগিয়ে দিলে। চৌকাদার ছোটবাবুকে দেখে সাহস পেয়ে শশীকে বেশ শক্ত ক'রেই বেঁধে ফেল্‌লে।

হরেন শশীকে চৌকীদারের হাতে সঁপে দিয়ে অরুণকে কি বল্‌বার জন্যে পিছন ফিরতেই শশী অস্ফুট স্বরে ঠোঁট উল্‌টে ব'লে উঠ্‌ল, "ইস্‌!—এই যে! বাপের তোজ্যিপুত্তুর!—তেজ্যিপুত্তুর—না তেজচন্দর্‌!"—কথাগুলো হরেনের কানে পৌঁছবার আগেই সেই আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি হাত জোড় ক'রে হরেনের পায়ের কাছে বসে প'ড়ে কাকুতির স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "রক্ষা কর ছোটবাবু, রক্ষা কর! এই সব্বনেশে নবট্‌লে বামুন আমার বোনকে খুন ক'রেছে! আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই গ্যাখো। তোমরা মনিব, তোমরা গ্যাখো, তোমাদের জানাচ্ছি, তোমরা বিচার কর।"

হরেন বল্‌লে, "খুন ক'রেছে তো শুন্‌ছি—তোমার বোন্‌কে?—লাশ কোথায়?"

"এই যে দাদা, এইদিকের এই ঘরে দেখে যাও একবার, কি কাণ্ড করেছে!"

হরেন স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন যেতে যেতে অরুণকে বল্‌লে, "অরুণ, লাশ পুলিশে চালান দেবার আগে তুমি ভাই, একবার দৌড়ে ডাক্তার বাবুকে খবর দাও।"

অরুণও তাই চাইছিল, সে মৃতদেহ দেখ্‌তে নিতান্ত নারাজ। কারণ তার ভুতের ভয় বেশ একটু প্রবল। হরেনের কথায় তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ভিন্ন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

৩১

যে আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি লাশ দ্যাখাবার জন্যে হরেনকে ডেকে নিয়ে গেল, সে হচ্ছে মাতির বোন কাতি, অর্থাৎ মাতঙ্গিনীর বোন কাত্যায়নী। এই মাতঙ্গিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হরনাথ মৈত্র একদিন শশী মুখুয্যেকে একঘ'রে করতে চেয়েছিলেন। হরনাথের আন্দোলনের ফলে শশী মুখুয্যের রঙ্গিনী রামী অর্থাৎ কৈবর্ত্তদের মাতঙ্গিনী, জমীদারের কড়া-হুকুমে গ্রাম ছেড়ে হাটতলায় ঘর নিতে বাধ্য হ'য়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনীর দিদি কাত্যায়নীর মুদিখানার দোকানটিও স্থান-পরিবর্ত্তনের নোটিশ্‌ না দিয়েই হাটতলায় এসে হাজির হ'য়েছিল। কাত্যায়নীর তাতে শাপে বর হ'ল। তিনখানা গাঁয়ের লোক তার খরিদ্দার হ'ল; তা ছাড়া ষ্টেশনের রাস্তার উপর ব'লে ছোট-বড় সবারই পায়ের ধূলো তার দোকানে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আয় অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু বাহাদুরীটা নিলে শশী মুখুয্যে। সে বল্‌ত তার জন্যেই তো এখানে দোকান হ'ল। নিরীহ কৈবর্ত্তের মেয়েরা শশীর এ-কথায় প্রতিবাদ করত না। কথাটা শুনতে শুনতে তাদের একরকম বিশ্বাসই জন্মে

গিয়েছিল! ঠিক কথাই তো, শশীর জন্যেই তো সব, নইলে এমন রোকের জায়গায় দোকান হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

জায়গাটা শশী মুখুয্যের পক্ষে একটু দূরপাল্লা হ'লেও আনাগোনা বন্ধ হ'ল না।

মাতঙ্গিনী ছিল কর্ত্তাভজা, শশী ছিল তার ভজনের কর্ত্তা। কর্ত্তার সমস্ত আবদার সমস্ত উপদ্রব সহ্য ক'রে তার সেবা ক'রে যেতে হয়, এই হ'ল কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের মর্ম্মকথা। কিন্তু ধর্ম্মের এই সুস্পষ্ট আদেশসত্ত্বেও ইদানীং কিছুদিন থেকে মাতঙ্গিনীর একটু ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল। সে আর আগেকার মতন তেমন মনের সঙ্গে মুখুয্যের সেবা কর্‌তে পার্‌ত না। এতে মাতঙ্গিনীকে বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না। মাস-কতক আগে মাতঙ্গিনী তার কল্‌কেতাপ্রবাসী মরণাপন্ন মাসীর টেলিগ্রাম পেয়ে তার সেবার জন্যে কল্‌কেতায় যায়। কাত্যায়নী দোকানের লোকসান হবে ব'লে যেতে পার্‌লে না। তাই ছোটো হ'লেও, দিদি থাক্‌তে মাতঙ্গিনীকেই সেই শশীর সেবা ছেড়ে মাসীর কর্‌না করতে যেতে হ'ল।

সেখানে চূড়ামণি-যোগে স্নান ক'রে এবং মাসীর ৺হাঁসপাতাল-প্রাপ্তির পর, উত্তরাধিকার-সূত্রে, তাঁর সোনার দানা, সোনার তাগা, রূপোর চাবি-শিকলি, খান-ছয়-সাত গিনি, ও শ'দেড়েক নগদ টাকা অঞ্চলস্থ ক'রে মাতঙ্গিনী গাঁয়ে ফেরে।

ফিরে এসে মাতঙ্গিনী শশীকে যেদিন প্রথম তার ধন-দৌলৎ দ্যাখালে, সেইদিন থেকেই শশী জিনিসগুলি, হস্তগত কর্‌বার জন্যে

টোপ ফেল্‌তে সুরু কর্‌লে। শেষে অনেক হুপিয়ে, সুদে খাটিয়ে টাকা বাড়িয়ে দেবার নাম ক'রে জিনিসগুলি বিক্রী ক'রে, সেই টাকায় শশী নিজের নামে বিঘে-কতক জমী, যোগেন মিত্তিরের একজন দেন্‌দার প্রজার কাছ থেকে দাঁও-মাফিক বাগিয়ে নিলে। কিন্তু মাতঙ্গিনীকে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিলে না। সে বেচারা সুদের জন্যে শশীকে তাগিদ দিলে, শশী তাকে সুদের সুদ আদায় ক'রে দেবে ব'লে স্তোক দিত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

এ বিষয়টার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌বার জন্যে মাতি আর কাতিতে অনেক যুক্তি-পরামর্শ হ'য়েছে, কিন্তু সে শেয়ালের যুক্তি। শশীর কাছ থেকে একটা খোলসা জবাব নেবার জন্যে অনেকবার মৎলব আঁটা হয়েছে; কিন্তু ম্যাও ধরে কে? শশীর মুখের কাছে এগোয় কে? জমীদারী-সেরেস্তার লোক, কলমের আঁচড়ে হয়-কে নয় কর্‌তে পারে, ওকে ঘাঁটিয়ে লাভের চেয়ে লোক্‌সানের সম্ভাবনাই বেশী। এই-সব সাত-পাঁচ ভেবে কথাটা ধামা-চাপাই থে'কে যেত। তা' ছাড়া কাতি বল্‌ত, "মাসী ভালোবেসে তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কপালে না থাক্‌লে ভোগ হয় না। সবই কপাল। আমায় কেউ কিছুই ছায়নি, তবু যা হোক্, দোকানের দৌলতে, ভাতের পাতে নিত্যি মাছের মুড়ো, দুধের বাটি না জুটুক্, দু'বেলা দু'মুটো জুট্‌ছে তো।"

এতে মাতি আরো চ'টে যেত, সে শ্লেষ-দেওয়া কথা মোটেই সইতে পার্‌ত না। হয় দু'জনে ঝগড়া বেধে যেত, নয় তো মুখ অন্ধকার ক'রে মাতি দুম্‌দুম্ শব্দে নিজের ঘরে গিয়ে খিল্ এঁটে

দিত। আজও অম্নি বোনের সঙ্গে শশীকে টাকা তাগিদ দেওয়ার কথা নিয়ে খিটিমিটি ক'রে মাতঙ্গিনী নিজের ঘরে ঢুকে যেমন কপাট দিয়েছে, অম্নি শশী এসে দরজায় ধাক্কা দিলে।

মাতঙ্গিনী ধড়াস্ ক'রে খিলটা খুলে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে, হারিকেনের সাম্‌নে সুপুরি কাট্‌তে বস্‌ল।

মাতঙ্গিনীর রংটি মেটে, চেহারাটি একটি বিপুল কচ্ছপের মতন। তার ধড়খানা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ, মুখখানি মাঝারি কচ্ছপ; ফুলো-ফুলো হাত-পাগুলি বাচ্ছা কচ্ছপ! নামে আর রূপে মিলিয়ে একেবারে গজ-কচ্ছপী ব্যাপার! তার কানে গোটা-আষ্টেক রিং-মাকড়ী, নাকে লঙ্গফুলী নাকছাবি। গলায় তুলসীর কণ্ঠী, মাঝে মাঝে মুড়কীর সাইজের সোনার মাদুলি। নীচে-হাতে সবুজ কাঁচের রেশমী চুড়ি, তার সঙ্গে মরা রূপোর আটগাছা ক'রে ষোলোগাছা গোখ্‌রি। উপর-হাতে তারকনাথের তাগা, তাতে গুটি-দুই পলা, গুটিচারেক মাদুলি, একটা নিমুখোর ফল, আর-একটা পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। তাগার ময়লা মুদোটা আধহাত লম্বা হ'য়ে ঝুল্‌ছে।

ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে কেওড়া কাঠের তক্তপোষ। একখানা জল-চৌকি, একটি কড়ি-বাঁধা কলি হুঁকো, লাট্টুর মতন বিচিত্র রঙের একটি আল্‌না, তাতে পাঁচপেড়ে, তিনপেড়ে, মাছপেড়ে, ফুলপেড়ে শাড়ীর সঙ্গে বেগ্‌নী রঙের একখানা খেজুরছড়ি কাপড়, আট-পাটি দাঁত মেলিয়ে যেন হাস্‌ছে। দেয়ালে খানকয়েক ফ্রেমে বাঁধানো কালীঘাটের পট।

শশী যখন মাতঙ্গিনীর ঘরে ঢুক্‌ল, তখন সন্ধ্যা। হরনাথ মৈত্রের খিড়্‌কীর বাগান থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তার মনটা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আন্‌চান্ কর্‌ছিল। সে মনে করেছিল কমলা ডুবেছে। এতে তার খুসী হবার কথা, কারণ, কমলা হরনাথের মেয়ে, হরনাথ শশীকে একঘরে কর্‌তে চেয়েছিল। কমলার মৃত্যুতে শশীর সেই অপমানের প্রতিশোধ। শশী মনে কর্‌ছিল, শশী খুসীই হয়েছে; যা' একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তা' বোধ হয় খুসী জানাবার দোসর পাচ্ছিল না বলেই। সে অনেক আগেই মাতঙ্গিনীর কাছে আনন্দ জ্ঞাপন কর্‌তে আস্‌ত, কিন্তু যোগেন মিত্তিরের হোঁৎকা ছেলেটা দরজায় ধর্‌না দিয়ে তাকে হক্-নাহক্ দেরী করিয়ে দিলে। হরেন চ'লে যেতেই শশী গলি-রাস্তায় লোকের আনাচ-কানাচ দিয়ে মাতঙ্গিনীর বাড়ী এসে হাজির হ'ল এবং ঘরে ঢুকেই উড়্‌নি-জড়ানো সাজান-পুরী বেগম ওর্‌ফে ধান্যেশ্বরীর বোতলটি বার ক'রে ঢুকুঢুকু সুরু ক'রে দিলে।

তিন চার পাত্র পেটে প'ড়েও যখন নেশা জম্‌ল না, তখন শশী মাতঙ্গিনীকে একপাত্র প্রসাদ দিয়ে তরিবৎ ক'রে গাঁজা সাজ্‌তে বস্‌ল। মাতঙ্গিনীর মন ভালো ছিল না, সে শশীর দিকে পিছন ক'রে পাত্র উপুড় ক'রে সমস্ত প্রসাদটুকু ডাবরে ঢেলে দিলে।

শশী ততক্ষণে কল্‌কেয় সাপি জড়িয়ে ব'সে গুটি-তিনেক দম লাগিয়ে, কল্‌কে উপুড় ক'রে দিয়ে আপনার খেয়ালে হাস্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছে।

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে শশীর আপাদ-মস্তক একবার তীব্র দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললে, "মরণ আর কি, শুধু শুধু হেসে মরা হচ্ছে কেন?"

শশী চোখদুটো শিবনেত্র ক'রে সমস্ত শরীরটা ঈষৎ দুলিয়ে বললে, "খুসী হ'লেই হাসি, হাসি হ'লেই খুসী, হাসি-খুসী, হাসি-খুসা!"

মাতঙ্গিনী বললে, "হাসি-খুসী যে খুব দেখ্‌ছি,—এখন টাকাটার কি হ'ল বল দেখি?"

শশী বললে, "আরে টাকা কি বল্‌ছিস্‌—এমন খবর তোকে দিতে পারি—যার দাম লাখ টাকা,—টাকার কথা কি বল্‌ছিস্‌?—আজ কি হ'য়েছে তা জানিস্‌?...জানিস্‌ নি; তবে শোন্‌—সেই খোলা-কাটা ধীরেন্দ্র ব্যাটার মেয়ে...কম্‌লি রে কম্‌লি...ডুবে মরেছে;...তিনকুলে কেউ জায়গা দিলে না...শাশুড়ী না,—মা-বাপ না,—যাবে কোথায়—পুকুর-জলে ডুবে মরেছে —আমি স্বচক্ষে এই দেখে আসছি।

যদিচ শশী কমলাকে ডুবতে ছাখেনি, তবু সে জোর-গলায় বললে, "স্বচক্ষে দেখেছি"। শশীর মতন যারা পাকা খেলোয়াড় লোক, তারা নিজের চালের ও নিজের বুদ্ধির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের একরকম দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব'লেই মনে করে। আত্ম-অবিশ্বাস এদের কুষ্টিতে লেখেনি। এ বিষয়ে শশী শয়তানের ভায়রা-ভাই বা মাস্‌তুতো ভাই। মনের মতন কল্পনাকে সে কলে-কৌশলে অনেকবার ফলিয়ে তুলতে পেরেছে ব'লেই, সে ঠিক

ক'রে রেখেছে, তার যা মনের মতন তা ফল্‌বেই! সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিল, কমলা মরেছে, নির্ঘাৎ মরেছে, ডুবে ম'রে ভেসে উঠেছে। তাই সে বল্‌লে "আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

মাতঙ্গিনী চোখ কপালে তুলে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে ব'লে উঠ্‌ল, "বল কি মুখুয্যে! ছুঁড়ি ডুবে মরেছে?"

"হুঁ, ডুবে মরেছে—আত্মহত্যা করেছে—পেত্নী হবে—ফের টাকার তাগাদা করিচিস্ কি তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে!—হুঁ হুঁ, বামুনের কথা মিথ্যে হয় না!"

মাতঙ্গিনী চ'টে উঠে বল্‌লে, "ঘাড় আমার ভাঙ্‌বে না তোমার ভাঙবে?—তুমিই তো বামুনের মেয়ের নামে—হয়-না-হয় বদনাম দিয়ে এই কাণ্ড ঘটালে!—আহাহা!—ছুঁড়ি বেঘোরে মারা গেল গা—ইস্ত্রি হত্যে—বেম্ম হত্যে—ছিঃ!"

শশী ত্যারছা ভাবে একটা কটাক্ষ হেনে বল্‌লে, "মাতি! তুই মাতাল হইচিস্!"

মাতঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে, "মুখে আগুন মাতালের,—তোমার মদ ঐ ডাবরে—ইচ্ছে হয় শুঁকে ছ্যাখো;—ছিছি!—এত অনাচার ধম্মে সইবে না—ছিঃ!—মানুষকে খানে-খাঁরাপ করা—ছিঃ—ছিঃ, বামুনের মন্তির ভয় নেই—"

শশী ক্রমশঃ তেতে উঠ্‌ছিল, সে তার ঘোলা চোখ্‌টাকে বিকট রকম ঘুলিয়ে এবং ঘুরিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লে—"বামুন—হুঃ! বামুন খোলা-কাটা বামুন—ভারি বামুন—আমার কাছে আবার বামুন কোন্ ব্যাটা? ফুলের মুখুটি নসী মুখুয্যের নাতি

শশী মুখুয্যে, আমায় কিনা ব্যাটা বলে একঘ'রে করবে? ব্যাটা পিণ্ডিখোর পুরুৎ—এত-বড় আস্পর্দ্ধা পুরুৎ বামুনের?—বামনাই ফলায় আমার কাছে? এখন সাম্‌লাও ঠেলা!"

মাতি মনে মনে তার মা-গোঁসাইকে নমস্কার ক'রে স্বগত বল্‌লে, "অপরাধ মাপ কোরো মা-গোঁসাই, আমি এ নচ্ছারের ওপর আর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখ্‌তে পারলুম না। এতে আমার যা পাপ হয় তা' হবে।" প্রকাশ্যে বল্‌লে, "যাও, যাও, আর বড়াই করতে হবে না। উচিত কথা বল্‌ব; তাতে বন্ধু বেগ্‌ড়ান, বেগ্‌ড়াবেন। বলে—

'অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী
তাহার অধিক পাপী বিশ্বাসঘাতকী'।

তুমি আবার বামুন, তুমি মহাপাপী! যে মানুষ ইহকাল-পরকাল খুইয়ে অ্যাদ্দিন ধ'রে তোমায় ঠাকুর-সেবা করলে, তার সর্ব্বস্ব সুদের লোভ দেখিয়ে ফুস্‌লে বার ক'রে নিয়ে ফাঁকি দিলে, মেয়েমানুষের টাকা হজম করলে; তারপর আর এক ভালো-মানুষের মেয়ের নামে মিছি-মিছি বদনাম দিয়ে তার একাল-আখের খেয়ে দিলে, তার আবার বামনাই?—মুখে আগুন তার;—গলায় দড়ি, সে আবার মানুষ?"

শশী বল্‌লে, "দ্যাখ্, মাতি, রাগাস্ নি বলছি,—আমি মিছিমিছি বদনাম দিইছি? স্বচক্ষে দেখিছি!"

মাতি বল্‌লে, "মরণ আর কি, বলে

'জেনে শুনে মিথ্যে বলে,
তার দোলা নরকে দোলে!'—

মিছে ক'রে বদনাম দাওনি কম্‌লির নামে? মাসীর অসুখের সময় কল্‌কেতায় সোহাগ ক'রে চিঠি লেখা হয়েছিল যে—তাতে কি লিখেছিলে মনে নেই?—দাওনি মিছি-মিছি বদ্‌নাম? নও মিথ্যেবাদী?"

শশী মুখুয্যে রাগে গির্‌গিটির মতন মাথা উঁচু ক'রে গর্‌গর্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

মাতি বল্‌লে, "কি, গির্‌গিটির মতন খাড়া হয়ে উঠ্‌ছ কেন? চোখদুটো খুব্‌লে নেবে নাকি?"

চোখ খোব্‌লানোর কথায় কাণা-শশীর ভোঁ ক'রে মাথা ঘুরে গেল। ধাঁ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সে কর্কশ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "তরে রে পাজী, ছোটলোক, ক্যাওট, যত-বড় মুখ, তত-বড় কথা!—আমি গির্‌গিট্টি?"

"খবর্দ্দার বামুন, বেরিয়ে যা ঘর থেকে, গায়ে হাত তোল্‌বার তুই কে?—সর্ব্বস্ব হজম ক'রে—এখন ক্যাওট—ক্যাওটের ভাত মেরে এখন ক্যাওট—বলে 'ভাত-কাপড়ের খোঁজ নেইক, নাক কাট্‌বার ঠাকুর!' দূর হ'য়ে যা ঘর থেকে!"

"ছাখ্‌ মাতি, তুই বড় বাড়িয়েছিস্‌; জমীদার চাল কেটে দেশ-ছাড়া ক'রে দিচ্ছিল, আমি যার ব'লে ক'য়ে হাটতলায় জায়গা দেওয়ালুম, তাই মাথা গুঁজে থাক্‌তে পেইচিস্‌।—আমার উপর ট্যাক্‌ ট্যাক্‌?—সবুর কর্‌—মাথায় ঘোল ঢেলে দেশ-ছাড়া কর্‌ছি—সবুর কর্‌।—বল্‌ছি জমীদারকে—বড় বাড় বেড়েছিস্‌।"

ঘোল-ঢালার কথায় মাতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল, সে

বল্‌লে, "জমীদার ?—যা'না জমীদারের কাছে,—আমিও সেখানে যেতে জানি, যাব—বল্‌ব—সব ফাঁস ক'রে দেব—তার ব্যাটার নামে মিথ্যে বদ্‌নাম দিয়ে তাকে তেজ্যিপুত্তুর করিয়েচিস্—সব বল্‌ব—অন্দরের ভিতর গিয়ে গিন্নিঠাকরুণকে বল্‌ব।—আমায় তুই চিনিস্‌নি!"

"যা, যা; যা' না, কস্‌বীর কথায় কে বিশ্বাস করবে? হেঃ যা'না, গিয়ে একবার মজাটা ছাখ্‌না।"

মাতঙ্গিনীর রোখ চেপে গিয়েছিল, সে বল্‌লে, "বিশ্বাস করে কি না করে, সে আমি বুঝ্‌ব,—কল্‌কেতার দরুণ সেই চিঠি নিয়ে যাব, গিয়ে গিন্নিঠাকুরুণকে দেব,—বাবুদের ছাখাব;—সে চিঠি আমি ফেলিনি—কোনো কাগজ আমি ফেলি নি—সব আছে—তা জানিস্!"

হঠাৎ নরম হ'য়ে শশী বল্‌লে, "মাতি, রাগ করলি?"

মাতি বল্‌লে, "রেখে দে তোর সোহাগ, কাতির বোন্ মাতি তোর শুক্‌নো আদরে আর ভুলছে না।"

শশী বল্‌লে, "সে চিঠিটা কোথায় রেখেছিস্ ছাখা না।"

"ইস্!—কেন?…না ছাখাব না; কি করবি তুই বামুন,—তোর বিষ-দাঁত আমি ভাঙ্‌ব,—আমার বুক-ভরা সোনা হজম করেছিস্—আমার সর্ব্বস্ব খেইচিস্—সব বল্‌ব—জোচ্চোর—বাট্‌পাড়—বেইমান বামুন!"

শশী রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বল্‌লে, "দিবি নি?"

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "না দেব না!"

"দি বি নি ?"

"না !"

"দিবি নি ?"

মাতঙ্গিনীর জিদ্ বেড়ে গেল, সে বারবার তিনবার বল্‌লে "না।" মদে গাঁজায় শশীর মগজ একেই ভয়ঙ্কর তেতেছিল, তার উপর মাতঙ্গিনীর এই-সব কাটা কাটা কথায়, ও চাকরী যাবার ভাবী সম্ভাবনায় সে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল। চালাকি ক'রে, সময় মতন চিঠিটা বার ক'রে নেবার তার আর তর্ সইল না! ফিচেল্ শশী হঠাৎ গোঁয়ারের মতন মাতঙ্গিনীকে একেবারে চিৎ ক'রে ফেলে, তার বুকের উপর দুই হাঁটু দিয়ে জেঁকে ব'সে গলাটা সজোরে টিপে দমক দিতে লাগ্‌ল। মাতঙ্গিনীর আর্ত্তনাদে ও গোঁ গোঁ শব্দে কাত্যায়নী দোকান ছেড়ে যখন মাতঙ্গিনীর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুক্‌ল, তখন মাতঙ্গিনীর দম বন্ধ হ'য়ে গেছে।

"ছাড়, ছাড়, খুন করলে হতভাগা, খুন করলে" ব'লে কাত্যায়নী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে দেখে শশী মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে বোতল ছুঁড়ে কাত্যায়নীকে ঘায়েল করে। কাত্যায়নী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চেঁচিয়ে, গাল দিয়ে কেঁদে সরগরম ক'রে তুল্‌লে। শশী এই সুযোগে স'রে পড়ছিল, কিন্তু একে হাট-বার তায় ম্যাজিষ্ট্রেটের অভ্যর্থনার জন্যে হাট-বাট দোকান-পাট সাজানো হচ্ছে দেখে, অনেক হাটুরে ও নিষ্কর্ম্মা লোক সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও জটলা ক'রে হাকিম দর্শনের অপেক্ষায় ছিল। জন-দুই চৌকীদারও পুলিশের তরফ থেকে সাজানোর কাজ তদারক করছিল। কাজেই শশীর

মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। সে জমীদার-সরকারের লোক, ব'লেও রেয়াৎ পেলে না। ধর্ম্মের কুল নেহাৎ বাতাসেই নড়ে গেল।

৩২

যে গাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কালীগ্রামে আস্‌বার কথা ছিল, সে গাড়ীতে তিনি আসেন্ নি। যোগেন মিত্তির ষ্টেশনে গিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর বদলে তাঁর নামে এক তার এসে হাজির। তাতে যা' লেখা আছে তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সাহেবের গ্রাম পরিদর্শনে আসা হ'ল না, সেজন্যে তিনি দুঃখিত। তবে আশা করেন, যে, দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি সেরে উঠ্‌বেন এবং কালীগ্রামে পায়ের ধুলো দেবেন। সমস্ত আয়োজন পণ্ড হওয়ায় এবং খরচ দোকর হবার সম্ভাবনায় যোগেন মিত্তির মনে মনে দস্তুরমতন বিরক্ত হ'য়ে, হাতীটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে স্বয়ং টম্ টুম্ হাঁকিয়ে আগেই গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লেন। খানিকদূর গিয়ে চাঁদের আলোয় হঠাৎ মৈত্র মশায়কে দেখে গাড়ী থামালেন।

"প্রাতঃপ্রণাম মৈত্র মশায়, এত রাত্রে ?"

"রেলের ওপারে ডোমাই-চণ্ডীতলায় একটু দরকার ছিল,—একজন যজমানের অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, লোকটি অনেকদিন থেকে ভুগ্‌ছিল।—তা গিয়ে শুন্‌লুম, মারা গিয়েছে—তাই ফিরছি।"

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন, "আসুন আমার গাড়ীতে।" মৈত্র মশায় একটু ইতস্ততঃ করতে করতে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। গাড়ী রশি-খানেক গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা নিলে। তখনো হাটের ফিরতি দু'একখানি গোরুর গাড়ী, নিদ্রোত্থিত বেতো রুগীর মতন আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে গ্রামান্তরে চলেছে।

যোগেন মিত্তির স্বয়ং গাড়ী হাঁকাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর সিগারের তৃষ্ণা প্রবল হওয়ায়, রাশ, চাবুক, সিগার, দেশালাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন, এবং জমীদার ক'রেও বিধাতা যে কেন তাঁকে চতুর্ভুজ করেন নি, তা বুঝ্‌তে না পেরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গাড়ী থামালেন। তারপর অনেক রকম কায়দা ক'রে মেঠো হাওয়ার ফুস্‌-মন্তর থেকে দেশালাইয়ের শিখাটিকে বাঁচিয়ে সিগারটি প্রায় ধরিয়েছেন এমন সময়ে "রাখো ; রাখো !" শব্দে তাঁর চমক ভাঙল্‌। সাম্‌নে দেখ্‌লেন ডাক্তারের পাল্‌কী। ডাক্তার বাবু পাল্‌কী থেকে নেবে প'ড়েই একেবারে টম্‌টমের কাছে হাজির হ'লেন। সিগারটা দাঁতে চেপে রাশ-চাবুক একসঙ্গে নাক বরাবর উঁচিয়ে যোগেন মিত্তির বল্‌লেন, "প্রাটঃপ্রণাম, ডাক্‌টরবাবু যে" !

ডাক্তার বাবুটি কালীগ্রামে নতুন এসেছেন, জাতে ব্রাহ্মণ, তাই বয়সে যোগেন মিত্তিরের চেয়ে ঢের ছোট হ'লেও কায়স্থ জমীদারের প্রাতঃপ্রণামের জবাবে তিনি ঠিক আশীর্ব্বাদ করলেন কি 'বক' দেখালেন, তা স্পষ্ট রকম বোঝা গেল না। তিনি

বল্লেন, "একবার ডোমাই-চণ্ডীতলায় যেতে হবে. একটি রুগী আছে।"

যোগেন মিত্তির বল্লেন, "সে আর কষ্ট ক'রে কেন যাবেন, তাঁর হ'য়ে গেছে। এই যে মৈত্র মশায় সেখান থেকে আস্ছেন।"

মৈত্র মশায় বল্লেন, "ডোমাই-চণ্ডীতলার চৌধুরীদের ন'কর্ত্তা তো—তাঁর হ'য়ে গেছে।"

বাড়ীর দিকে ফিরবেন কি চৌধুরীদের দেউড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে আস্বেন, ঠিক করতে না পেরে, মিনিটখানেক ডাক্তার বাবু 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় টম্টমের ঘোড়ার পুচ্ছ পর্য্যবেক্ষণ করলেন। হঠাৎ ডাক্তারের মগজের ভিতর তৃতীয় পন্থা খুলে গেল। তিনি ব'লে উঠ্লেন, "ভালো কথা, বল্তে ভুলেছি, খাজাঞ্জি-খানার শশী মুখুয্যের বড় বিপদ, লোকটা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়েছে?"

যোগেন মিত্তির বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "কি রকম?, সে তো অসুখের নাম ক'রে ছুটি নিয়ে গেছে: আমার আম্লা পুলিশের হাতে কি-রকম?"

তখন ডাক্তার ভিজিটের শোক ভুলে পরম প্রগল্ভতার সঙ্গে আদ্যোপান্ত সমস্ত বল্তে সুরু করলেন।

তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্মটা এই রকম;—

চৌধুরীদের ন-কর্ত্তাকে দেখ্তে যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় হাট-তলার কাছ-বরাবব এসেছেন, এমন সময়, মৈত্র মশায়ের ছেলে অরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে মাঝপথে তাঁকে

গ্রেপ্তার ক'রে হাটে একটা জরুরি কেসের নাম ক'রে ডেকে নিয়ে যায়। তিনিও জরুরি কেস্ শুনে, তাঁর ভিজিটের টাকা কে দেবে, সে-কথা না ভেবে-চিন্তেই ডাক্তারের যা' কর্ত্তব্য তাই করেন। সেখানে যাকে দেখ্‌বার জন্যে তিনি গিয়েছিলেন, সে একজন স্ত্রীলোক। প্রথমে তাকে মৃত ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু, পরে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে তার চৈতন্য-সম্পাদন করা হয়।

আরেকটি স্ত্রীলোক, বোধ হচ্ছে তার বোন হবে,—সে বল্‌লে যে শশী মুখুয্যে, মাতাল অবস্থায় বোতল মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এর আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটিকে ঐ-রকম মাতাল অবস্থাতেই গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছে দেখে সে ধর্‌তে গিয়েছিল, এই তার অপরাধ। ডাক্তার বাবু দারোগাকে খবর পাঠান, তিনি এসে দু'জন স্ত্রীলোকেরই এজেহার লিখে নিয়েছেন। ডাক্তার বাবু এ-সব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তেন না; কারণ ঘটনার সময়ে তিনি কালীগ্রামে কর্ম্মগ্রহণই করেন নি। এজেহারে যা' শুনেছেন তাই বল্‌ছেন। সুতরাং মৈত্র মশায় যেন কিছু মনে না করেন। এজেহারে প্রকাশ, শশী মুখুয্যের সঙ্গে প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির প্রসক্তি ছিল এই কথাটা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় মৈত্র মশায় নাকি শশীকে একঘ'রে কর্‌বার চেষ্টা করেন। শশীর রাগ ছিল। তাই মৈত্র মশায়ের মেয়ে যখন কল্‌কেতায় হারিয়ে যায়, তখন মৈত্রকে জব্দ কর্‌বার জন্যে শশী একটা মিথ্যা-কলঙ্ক রটিয়ে দ্যায়। আজ নাকি সেই সব কথা নিয়ে

দুজনে কি বচসা হয়। স্ত্রীলোকটি শশীর এই সমস্ত কীর্ত্তির কথা ফাঁস ক'রে দেবে বলে। তাই নেশার ঝোঁকে রাগের মাথায় শশী তার গলা টিপে ধরে। স্ত্রীলোকটি বলে, চূড়ামণি যোগের সময় যখন সে তার মাসীর কাছে কলকেতায় যায়, তখন নাকি শশী তাকে তার এই কীর্ত্তির কথা জানিয়ে এক চিঠি লেখে। মৈত্র মশায়কে জব্দ করবার সে যে অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন ক'রেছে তা' সবিস্তারে লেখে। সে চিঠি সে ফেলেই দিত, কিন্তু মাসীর দরুণ টিনের তৈরী গহনার বাক্সটার তলায় যে কাগজ-খানা পাতা ছিল, তা মরচে লেগে জ'রে যাওয়ায় ও হাতের কাছে অন্য কোন কাগজ না থাকায় সে গহনার বাক্সর তলায় শশীর ঐ চিঠিখানা বিছিয়ে তার উপর গহনাগুলি রেখেছিল। সে চিঠিও পাওয়া গেছে।

ডাক্তার বাবুর রিপোর্ট শেষ হ'লে যোগেন মিত্তিরের ভুরু-দুটোর মাঝখানে যে ভ্রুকুটিটা এতক্ষণ কামড়ে বসেছিল, সেটাকে উপরের দিকে ঠেলে কপালময় ছড়িয়ে দিয়ে, তিনি ব'লে উঠলেন, "হারামজাদার এত বড় আস্পর্দ্ধা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! জেলে পাঠাব! ব্যাটাকে চাল কেটে দূর ক'রে দেব। তবে আমার নাম যোগেন মিত্তির!—ওঃ এত বড় শয়তান!"

মৈত্র মশায়ের মুখ লাল, চোখে জল, কপালের শিরাগুলো সমস্ত ফুলে উঠেছে; দুঃখ-সুখের দোটানায় তাঁর ঠোঁটের চেহারা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। তিনি ভাঙা গলায় শুধু বল্লেন, "পাষণ্ড", আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

যোগেন্দ্র মিত্তির ডাক্তারকে পিছনে আস্‌তে ব'লে, বেগে টম্ টম্ হাঁকিয়ে দিলেন।

৩৩

কমলা ও সতীশ বাড়ীর দিকে যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সেই গো-শকটের মন্থরগতি আরোহী-যুগলের কাছে মোটেই বিরক্তিকর বোধ হয় নি। এ গাড়ী সগড় না হয়ে মোটর হ'লে—কমলার কথা, কমলা বলবার ও সতীশ শোনবার সুযোগ পেত না। আর বলা বাহুল্য, কমলার বলবার কথা অনেক ছিল আর সে তার স্বামীর কাছে তার জীবনের নূতন ইতিহাস তন্ন তন্ন করে বল্‌তে ত্রুটি করে নি। আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনে সতীশ মনে-মনে বল্লেন—"গল্প ত আগেই শুনেছি; এ ত ক্ষিতীশের রিপোর্টের অক্ষরে অক্ষরে কপি।"

কিন্তু কপি হলেও ক্ষিতীশ-দত্ত বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের পার্থক্য অবশ্য ছিল। একই জিনিষ পুরুষের হাতের লেখায় এক চেহারা আর মেয়ের হাতের লেখায় আর-এক চেহারা ধরে। কমলার বর্ণনার লাইনগুলো আঁকা-বাঁকা ও অক্ষরগুলো ছোট-বড় ছিল। এই কাঁচা হাতের বর্ণনায় কৌশলের লোশমাত্র ছিল না বলে ক্ষিতীশের কথার চাইতে কমলার কথা সতীশের মনে বেশি করে বসে গেল। সে কথা যে সত্য সে বিষয়ে সতীশের মনের কোন কোণে তিলমাত্র সন্দেহও আর রইল না। সতীশ মনে-

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

New Artistic Press, Calcutta.

মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক, সতীশ সীতার বনবাসের পুনরভিনয় প্রাণ থাকতেও করবে না। সতীশের ব্যবহারে, তার কথায় বার্ত্তায়, তার কণ্ঠস্বরে, তার ভাব-ভঙ্গীতে কমলা বুঝলে যে তার স্বামীর পুরো বিশ্বাস সে আবার ফিরে পেয়েছে! তখন তার মনে হল যে, সে সেই গঙ্গাস্নানের দিন পথশ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এইমাত্র সে জেগে উঠেছে। ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা সে মনে ভাবছে ঘটেছে, সে-সব দুঃস্বপ্ন মাত্র।

৩৪

এই ত গেল তাদের মনের খবর। কিন্তু মানুষের দেহ বলেও একটা জিনিস আছে—যার দাবী সুখে-দুঃখে কোন অবস্থাতেই মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। এই একটা দিনের ঘটনা মনে করলেই পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন, শ্রান্তি সতীশ ও কমলার দেহকে কতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল, ও ক্ষুধা তাদের কতদূর পীড়া দিচ্ছিল। গাড়ী বাড়ীর যত কাছে অসতে লাগল তারা দুজনে ততই আহার ও নিদ্রার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু কি আহার কি নিদ্রা ভগবান সেদিন তাদের কপালে লেখেন নি। বলা বাহুল্য, সে রাত্তিরে বাড়ী তারা অবশ্য পৌঁচেছিল, কেন না গরুর গাড়ীর আর যাই দোষ থাক—একটা মহাগুণ আছে। গরুর গাড়ীতে চাপ্লে, গরুর গাড়ীতে

কখন কলিসন হয় না—আর যদিও হয় তা হলে ব্যাপার তেমন মারাত্মক হয় না।

সতীশ ও কমলা সে রাত্তিরে তাদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয় পায় নি।

অনেক বকাবকির পর দুর্গামণি ছেলেকে শেষ-কথা বল্লেন এই যে কমলার হাতে জল তিনি কিছুতেই খাবেন না, তার সঙ্গে একত্রে বাস কিছুতেই করবেন না। সুতরাং সতীশকে হয় তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করে দিতে হবে—নয় তার মাকে।

কমলার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নি এ-কথা দুর্গামণি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না, কেননা সতীশের কথা শুনে তাঁর মনে এই বিশ্বাস অতি বদ্ধমূল হল যে, বউ তাঁর ছেলেকে যাদু করেছে; সতীশ কাকুতি-মিনতি করে রাগ দেখিয়ে ধমক দিয়েও যখন দেখ্‌লে যে তার মা কমলার নির্দ্দোষিতায় কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, তখন তার মুখ থেকে হঠাৎ এই কথা বেরিয়ে গেল যে কমলা সতীই হোক আর অসতীই হোক আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করব না।

এ-কথা শুনে দুর্গামণি কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে থেকে পরে অতি ধীরে বল্লেন,—

"ভগবান যদি আমার কপালে তাই লিখে থাকেন ত তাই হোক। আমি ছেলে ত্যাগ কর্‌তে পারব—কিন্তু ধর্ম্ম-ত্যাগ করতে পারব না।"

কমলা এতক্ষণ পটে-আঁকা ছবির মত এক পাশে দাঁড়িয়েছিল, একটি কথাও কয় নি। যখন তার বাবা তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন তখন তার শ্বাশুড়ী যে তাকে ঘরে তুলে নেবেন না, এতে আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি, দুঃখের বিষয়ই বা কি? সতীশচন্দ্র যখন মাকে প্রণাম করে উঠে বললেন—"চল কমলা, আমরা যাই" তখন কমলা জিজ্ঞেস করলে "কোথায়?" উত্তর এল, "দেশ ছেড়ে।" কমলা বললে "দেশ ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, মা ছেড়ে বেরবার আগে নিজের মনে বুঝে দেখো যে কাজ করতে যাচ্ছ তার শেষ রক্ষে করতে পারবে কি না।

"আমি মনস্থির করেছি, এ গ্রাম থেকে এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে পড়ব, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। শেষে যা হয় তা হবে; তার ভাবনা ভাববার এখন সময় নেই।" এর পর সতীশ তার পৈতৃক ভিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কমলার হাত ধরে সেই অন্ধকারের ভিতর নিরুদ্দেশভাবে বেরিয়ে পড়লো।

৩৫

অজানা পথের পথিক হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু মেয়ের পক্ষে তা নয়। স্ত্রীলোক যদি এক ঘর থেকে বেরয় ত সে আরেক ঘরে ঢোকবার জন্য। তাই কমলা সতীশের নিরুদ্দেশ-যাত্রার একটা লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে দিলে। স্থির হলো তারা দুজনে সতীশের কর্ম্মস্থল লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাবে,

কলকাতা হয়ে। লক্ষ্ণৌ দু'দিন পরে পৌছনতে কোনও ক্ষতি নেই—কেন না সতীশের ছুটি আজোও ফুরোয় নি। তা ছাড়া কমলা যে ইহলোকে আছে এবং তার স্বামীর আশ্রয়ে —এ সংবাদটা সে তার মা বাবাকে না জানিয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়াটা সঙ্গত মনে করলে না। পথি-মধ্যে স্বামা-স্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির করলে যে তারা কলকাতায় হরেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে দিয়েই খবরটা দেশে পাঠিয়ে দেবে। হরেনকে খুঁজে বার করতে তাদের কোনও কষ্ট পেতে হবে না। কমলা হরেনের বাসার ঠিকানা জান্‌ত।

তারা বেলতলিতে শেষ-রাত্তিরে ট্রেণ ধরে সকাল বেলা কলকাতায় গিয়ে পৌছল। তারপর এক ঠিকে-গাড়ীতে আরোহা হয়ে বরাবর বৌবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সতাশ গাড়া থেকে নেমে হরেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আবার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে খবর দিলেন যে, হরেন সে-বাসায় আর নেই। কিছুদিন আগে তার বাবা এসে সেখান থেকে তার মালপত্র যা-কিছু ছিল সব নিয়ে চলে গেছেন।

কমলা জিজ্ঞেস করলে—"হরেন এখন কোথায় থাকে মেসের কেউ কি তা বলতে পারে ন ?"

সতীশ আবার ফিরে গিয়ে হরেনের হালসাকিমের সন্ধান নিয়ে এল। কমলা রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর শুনে বল্‌লে—"ও ত ক্ষিতীশ বাবুর বাসা।" সতীশ প্রস্তাব করলে, "চল সেখানেই যাওয়া যাক্।" কমলা তাতে কোনও আপত্তি

করলে না। সত্য কথা বল্‌তে গেলে অস্বীকার করা চলে না যে, কমলা যখন কলকাতা ঘুরে লক্ষ্ণৌ যাবার প্রস্তাব করে তখন মনের কোণে এ আশা ছিল যে, কলকাতায় গেলে চাই কি ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে তার আর-একবার সাক্ষাৎ হলেও হতে পারে।

৩৬

ক্ষিতীশের বাসায় পৌঁছবা মাত্র সতীশের সঙ্গে প্রথম যার সাক্ষাৎ হল সে হচ্ছে কমলার ভাই অরুণ। কমলা গাড়ীতে বসে আছে, সতীশের মুখে এই কথা শুনে অরুণ আনন্দে এতই অধীর হয়ে পড়্‌ল যে, সে ছুটে গিয়ে তার দিদির কাছে যা বক্‌তে লাগ্‌ল, তাকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না; কেননা সে-সব কথার ভিতর কোনরূপ গাঁথুনি, কোনরূপ বাঁধুনি ছিল না। কিন্তু তার এই সব এলো-মেলো বকুনির ভিতর থেকে সতীশ ও কমলা এই মোট কথাটা উদ্ধার করলে যে সমস্ত গোল চুকে গিয়েছে, শশী মুখুয্যের জাল ধরা পড়েছে—আর গাঁয়ে কমলার কোন তল্লাস না পেয়ে মৈত্র মশায়, যোগেন মিত্তির, হরেন ও অরুণ কাল রাত্তিরে এখানে এসে পৌঁচেছে। নির্দ্দোষী কমলা তাদের দোষেই পথে দাঁড়িয়েছে এই জ্ঞান হওয়া মাত্র মৈত্র মশায় ও মিত্তির মশায় উভয়েরি একসঙ্গে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেলে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য কিছুই স্থির কর্‌তে না পেরে তাঁরা

অরুণও হরেনের পরামর্শ মত চল্‌তে স্বীকৃত হলেন। এরা দুজনে তাঁদের এখানে নিয়ে এসে উপস্থিত করেছে। এরা ধরে নিয়েছিল যে কমলা যদি আত্মহত্যা না করে থাকে তাহলে সে ক্ষিতীশের দ্বারস্থ হবে, কেননা, ক্ষিতীশ ছাড়া আর কারও কাছে আশ্রয় পাবার তার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মানুষ যখন জলে পড়ে ডুবে মরবার ভয় পায় তখন সে হাতের গোড়ায় যাকে পায় তাকে ধরে বাঁচ্‌তে চেষ্টা করে। তার পর অরুণ "দিদি এসেছে, দিদি এসেছে" বলে চীৎকার করতে-করতে কমলার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে কমলাকে ক্ষিতীশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে—যেখানে অপর সকলে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন।

হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে কমলার সঙ্গে তার গুরুজনদের মিলন হয়ে গেল। দৈবদুর্বিপাকে একটা ভেস্তে-যাওয়া পরিবার দৈবের কৃপায় আবার যেমন ছিল তেমনি গুছিয়ে উঠ্‌ল। প্রত্যেকে—যার যেখানে জায়গা সে সেইখানে বেমালুম বসে গেল। খালি তার বাইরে রয়ে গেল একমাত্র ক্ষিতীশ। এই মিলনোৎসবের ক্ষেত্র থেকে ক্ষিতীশ যে সরে পড়েছিল অনেকক্ষণ কেউ তা লক্ষ্যই করে নি। শেষটা মিত্তির মশায় হরেনকে দিয়ে ক্ষিতীশকে ডেকে পাঠালেন। ক্ষিতীশ এলে তাঁকে সম্বোধন করে যোগেন মিত্তির ভদ্রতা করে বল্‌লেন—"দেখুন ক্ষিতীশ বাবু, এই বিভ্রাটের জন্যে আমরা 'ওল্ড ফুল'রাই সম্পূর্ণ দায়ী।"

ক্ষিতীশ হেসে উত্তর করলে—"আপনাদের চাইতে বোধ

হয় বেশী দায়ী আমরা—'ইয়ং ফুলরা'। আমি যদি কমলাকে নিজের বাসায় না এনে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিতুম তাহলে এই ছোটখাটো ট্রাজেডিটি মোটেই ঘট্‌ত না।"

এ-কথাটা এতই সত্য যে কেউ আর তার প্রতিবাদ করলে না! ক্ষিতীশ অপ্রতিভ ভাবে নীরব হয়ে রইল দেখে হরেন বল্‌লে—"যা ঘটেছে তার জন্যে দায়ী তুমিও নয়, আমিও নই; দায়ী আমাদের হতভাগা সমাজ।" সতীশ বল্‌লে—"দোষ সমাজের নয়! দোষ আমাদের স্বভাবের! আমরা যৌবনকে ভয় করি, আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিনে।"

সতীশের এ-কথা শুনে বুড়োরা কে কি মনে করলেন তার কোন আভাস দিলেন না, বরং এ আলোচনা চাপা দেবার জন্যে যোগেন মিত্তির সতীশকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবাজী, এখন কি করবে স্থির করলে?" সতীশ বল্‌লে—"আজ রাত্তিরেই লক্ষ্ণৌ রওনা হব।"

"তোমার মাকে সুখবরটা জানিয়ে যাবে না?"

"আপনারা জানাবেন, আমি বল্‌লে তিনি বিশ্বাস করবেন না।"

"কমলা, একবার তার মার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

কমলা বল্‌লে—"এ যাত্রা নয়। এখন আমি গ্রামে যেতে পারব না। আমার শরীর-মন এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে আমি এখন কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম চাই; সে বিশ্রাম আমি দেশে পাব না।"

কথাটা শুনে কমলার গুরুজনদের মনে একটু খট্‌কা লাগল।

কিন্তু তাঁরা কমলার প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তারপর কমলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে কিছু করাবার অধিকার তাঁরা যে হারিয়েছেন সে জ্ঞান তাঁদের জন্মেছিল ; তাই তাঁরা কমলার কথার কোন প্রতিবাদ না করে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

এই নীরবতার ভিতর সকলেই একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন।

খানিক পরে মৈত্র মশায় বল্‌লেন,—

"বেশ, তাহলে এখানেই আর দুদিন থেকে যাও। তোমার মাকে এখানেই আমরা নিয়ে আসি। তারপর তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তুমি লক্ষ্ণৌ চলে যেয়ো।"

কমলা হেসে বল্‌লে—"ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ীতে বহুদিন বাস করেছি, আর এক দিনও আমার থাকা উচিত নয়। শুনেছি দেবালয়েও অতিথি দু-রাত্তিরের বেশী আশ্রয় পায় না।"

যখন সকলে বুঝ্‌লে যে কমলাকে বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা তখন তার প্রস্তাবেই সকলে সম্মত হলেন। শুধু অরুণ ধরে বস্‌ল যে সে তার দিদির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবেই-যাবে। এতে কারো বিশেষ আপত্তি হলনা। শেষ স্থির হলো যে, সতীশ, কমলা আর অরুণকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মৈত্র মশায়, মিত্র মশায় ও হরেন রাত্তিরের গাড়ীতে বাড়ী ফিরে যাবে।

ক্ষিতীশ সেদিন তার অতিথিদের জন্যে যে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল তাকে বিবাহের ভোজ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

আহারান্তে কমলা, মৈত্র মশায় ও মিত্র মশায় ঘুমুতে গেলেন। ক্ষিতীশ আর সতীশ দাবা খেলতে বসলো, হরেন ও অরুণ তাদের খেলা দেখতে লাগল। ক্ষিতীশ সতীশের কাছে বাজির পর বাজি হেরে শেষটা এই বলে খেলা ছেড়ে দিলে যে, তার বেজায় মাথা ধরেছে তাই সে মন দিয়ে খেলতে পারছে না। এতক্ষণে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দেখে সতীশ ক্ষিতীশ বাবুকে বাঁশি বাজাতে অনুরোধ করলে। সে অনুরোধ রক্ষা করতে ক্ষিতীশ কিছুতেই রাজি হল না। সে জানত আজকে তার বাঁশি বাজবে নাকি-সুরে, তার প্রতি ছিদ্র দিয়ে পড়বে শুধু তার চোখের জল!—আজকের দিনে নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেবার সাহস ক্ষিতীশের দেহে ছিল না।

রাত্তির নটায় সকলে মিলে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে সতীশ কমলা ও অরুণকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। এবং তার আধ-ঘণ্টার পরের ট্রেণে নিজেরাও বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পড়লেন। ষ্টেশনে একা পড়ে রইল ক্ষিতীশ। কেননা শূন্যগৃহে ফেরবার দিকে তার মোটেই লোভ ছিল না। হঠাৎ ক্ষিতীশের মনে হল যে, এ পৃথিবীতে সে নিতান্ত একা। এই কথা মনে করে তার কি-রকম একটা ভয় হল! বাকি রাত্তিরটা সে কোন মতে কাটিয়ে দিয়ে পরদিন সকাল থেকেই সে নিজের মোটরে চড়ে কলকাতা সহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগল যেন সে নিজের কাছ থেকে ক্রমাগত পালাবার চেষ্টা করছে

ক্রমে তার জ্ঞান হল যে, একটা কোন কাজ হাতে নিলে সে এ পৃথিবীতে মিছামিছি শুধু ছুটে বেড়াবে—তার মনের অশান্তি বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু কি সে হাতে নেবে তা ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে রাস্তার এক জায়গায় তার হঠাৎ কানে এল—

"মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।"

সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে একপাল স্কুলের ছেলে ঐ জয়ধ্বনি করতে করতে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

এই জয়ধ্বনি শোনবামাত্র ক্ষিতীশ মোটরের ভিতরেই লাফিয়ে উঠে বললে—"Thank God! আমার উপযুক্ত কাজ পেয়েছি। আমি কালই কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নন্-কো-অপারেটার হয়ে যাব।" বলা বাহুল্য, সে করলেও তাই, কেননা কোন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা দমন করবার কষ্ট ক্ষিতীশ অদ্যাবধি কখনও স্বীকার করেনি।

সমাপ্ত